আরো
গোয়েন্দা
গল্প

আরো গোয়েন্দা গল্প

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্পের

সংকলন

পুস্তকালয়

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

সম্পাদনা
বিশ্বনাথ দে

প্রচ্ছদ-চিত্র
বিমল দাস

প্রকাশক
পি. সাহা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর
নিরুপমা রায়
দি অন্নদা প্রিণ্টার্স
১৯ই, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

দাম
ছয় টাকা

যাঁদের লেখা আছে

সত্যজিৎ রায়	১	কৈলাস চৌধুরীর পাথর
প্রেমেন্দ্র মিত্র	২৮	আকাশের আতঙ্ক
সুকুমার দে সরকার	৪২	একটি চলে যাওয়া দিনের কাহিনী
মনোরঞ্জন ঘোষ	৫২	যমালয়ের টিকিট
জয়ন্ত চৌধুরী	৬৫	আদি-পর্ব
লীলা মজুমদার	৭৮	আশ্চর্য ব্যাঙ্ক ডাকাতি
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	৮৩	তেরো নম্বর বাড়ীর রহস্য

কৈলাস চৌধুরীর পাথর

সত্যজিৎ রায়

'কার্ডটা কিরকম হয়েছে ছাখ তো।'

ফেলুদা ওর মানিব্যাগের ভিতর থেকে সড়াৎ করে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে আমায় দেখতে দিল। দেখি তাতে ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে Prodosh C. Mitter, Private Investigator। বুঝতে পারলাম ফেলুদা এবার তার গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা বেশ ফলাও করে জাহির করছে। আর তা করবে নাই বা কেন? বাদশাহী আংটির শয়তানকে ফেলুদা যে-ভাবে সায়েস্তা করেছিল, সে কথা ও ইচ্ছে করলে সকলকে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াতে পারত। তার বদলে ও শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়াছে —এইতো!

ফেলুদার নাম আপনা থেকেই বেশ রটে গিয়েছিল। আমি জানি ও এর মধ্যে ছু'তিনটে রহস্যের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির অফার পেয়েছে, কিন্তু কোনটাই ওর মনের মত হয়নি বলে না করে দিয়েছে।

কার্ডটা ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে পা ছুটো টেবিলের উপর তুলে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'বড়দিনের ছুটিতে কিছুটা মাথা খাটানোর প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'নতুন কোন রহস্য বুঝি?'

ফেলুদার কথাটা শুনে ভীষণ এক্সাইটেড লাগছিল—কিন্তু বাইরে সেটা একদম দেখালাম না।

ফেলুদা তার প্যান্টের পাশের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বার করে তার থেকে খানিকটা মাদ্রাজী সুপুরি নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'তোর খুব উত্তেজিত লাগছে বলে মনে হচ্ছে?'

সে কী, ফেলুদা বুঝল কী করে?

ফেলুদা নিজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল। 'কী করে বুঝলাম ভাবছিস? মানুষ তার মনের ভাব যতই গোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, তার বাইরের ছোটখাটো হাবভাব থেকেই সেটা ধরা পড়ে যায়।

কথাটা যখন তোকে বললাম, ঠিক সেই সময়টা তোর একটা হাই আসছিল। কিন্তু কথাটা শুনে মুখটা খানিকটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। তুই যদি আমার কথায় উত্তেজিত না হতিস, তাহলে কিন্তু যথারীতি হাইটা তুলতিস—মাঝপথে থেমে যেতিস না।'

ফেলুদার এই ব্যাপারগুলো সত্যিই আমাকে অবাক করে দিত। ও বলত, 'পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা না থাকলে ডিটেক্‌টিভ হবার কোন মানে হয় না। এ ব্যাপারে যা খাঁটি কথা বলার সবই শার্লক হোম্‌স বলে গেছেন। আমাদের কাজ শুধু তাঁকে ফলো করা।'

আমি বললাম, 'কি কাজে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে বললে না?'

ফেলুদা বলল, 'কৈলাস চৌধুরীর নাম শুনেছিস? শ্যামপুকুরের কৈলাস চৌধুরী?'

আমি বললাম, 'না, শুনিনি। কত বিখ্যাত লোক আছে কলকাতা শহরে তার ক'জনের নামই বা আমি শুনেছি। আর আমার তো সবেমাত্র পনের বছর বয়স।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরা রাজসাহীতে বড় জমিদার ছিল। কলকাতায় বাড়ি ছিল; পাকিস্তান হবার পর এখানে চলে আসে। কৈলাসবাবুর পেশা হচ্ছে ওকালতি। তাছাড়া শিকারী হিসেবে নামডাক আছে। দুখানা শিকারের বই লিখেছেন। এই কিছুদিন আগে জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টে একটা হাতি পাগলা হয়ে গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করেছিল—উনি গিয়ে সেটাকে মেরে এলেন। কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু তোমার মাথা খাটাতে হচ্ছে কেন? ভদ্রলোকের জীবনে কোন রহস্য আছে নাকি?'

ফেলুদা জবাব না দিয়ে, তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমাকে দিল।

'পড়ে দ্যাখ্।'

আমি চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ে দেখলাম। তাতে এই লেখা ছিল—

'শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতবাজার পত্রিকায় আপনার বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপনাকে এই পত্র দেওয়া স্থির করিলাম। আপনি উপরোক্ত ঠিকানায় আসিয়া আমার

সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। কারণ সাক্ষাতে বলিব আমি এক্সপ্রেস ডেলিভারি যোগে এই পাঠাইতেছি, সুতরাং আগামীকল্য ইহা আপনার হস্তগত হইবে। আমি পরশু অর্থাৎ-শনিবার, সকাল ১০ টায় আপনার আগমন প্রত্যাশা করিব। ইতি।

—ভবদীয় শ্রীকৈলাসচন্দ্র চৌধুরী।'

চিঠিটা পড়ামাত্র আমি বললাম, 'শনিবার সকাল দশটা মানে তো আজই, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই।'

ফেলুদা বলল 'তোর দেখছি বেশ ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে। তারিখ-টারিখগুলো বেশ খেয়াল রাখছিস।'

আমার মনে এর মধ্যেই একটা সন্দেহ জেগে উঠেছে। বললাম, তোমাকেই যখন ডেকেছে তখন কি আর সঙ্গে অন্য কেউ....'

ফেলুদা চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বলল, 'তোর বয়সটা কম বলেই হয়ত তোকে সঙ্গে নেওয়া চলতে পারে। কারণ তোকে হয়ত মানুষ বলেই ধরবেন না ভদ্রলোক। কাজেই তোর সামনে কথাবার্তা বলতে আপত্তি করবেন না। যদি করেন তাহলে তুই না হয় পাশের ঘরে-টরে কোথাও অপেক্ষা করিস, সেই ফাঁকে আমরা কথা সেরে নেবো।'

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছুটিটা কি করব কি করব ভাবছিলাম। এখন মনে হচ্ছে হয়ত দারুণ ইণ্টারেস্টিং ভাবেই কেটে যাবে।

দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে আমরা ট্রামে করে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছলাম। পথে একবার ট্রাম থেকে নেমে ফেলুদা দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী থেকে কৈলাস চৌধুরীর লেখা একটা শিকারের বই কিনেছিল, সেটার নাম 'শিকারের নেশা' বাকি পথটা বইটা উল্টেপাল্টে দেখল। ট্রাম থেকে নামার সময় সেটা কাঁধে ঝোলানো থলির মধ্যে রেখে বলল, 'এমন সাহসী লোকের কেন ডিটেকটিভের দরকার পড়েছে কে জানে।'

একান্ন নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীট, একটা মস্ত পুরোন আমলের ফটক-ওয়ালা বাড়ি—যাকে বলে অট্টালিকা। সামনের দিকের বাগান, ফোয়ারা, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি পেরিয়ে বাড়ির দরজায় কলিং বেল টেপার আধ

মিনিটের মধ্যেই ভিতর থেকে পায়ের আওয়াজ পেলাম। দরজা খুলতে দেখি একজন ভদ্রলোক, যাকে দেখে কেন জানি মনে হল, তিনি কখনই কৈলাসবাবু ন'ন, কারণ বাঘ মারা মানুষের এমন গোবেচারা চেহারা হতেই পারে না। মাঝারি সাইজের মোটা-সোটা ফর্সা ভদ্রলোক—বয়স ত্রিশের বেশি বলে মনে হয় না। চোখের চাহনিতে কেমন জানি একটা সরল, ছেলেমানুষী ভাব। লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের হাতে একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস রয়েছে।

'কাকে চান আপনারা ?' গলার আওয়াজ দেখলাম মানানসই রকমের মিহি ও নরম।

ফেলুদা একটা কার্ড বার করে ভদ্রলোককে দিয়ে বলল, 'কৈলাসবাবুর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। উনি চিঠি দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আসুন ভিতরে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি পেরিয়ে ভদ্রলোক একটা আপিস ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন।

'আপনারা একটু বসুন আমি মামাবাবুকে খবর দিচ্ছি।'

বহুদিনের পুরোন একটা কালো টেবিলের সামনে দুটো পুরোন হাতলওয়ালা চেয়ারে আমরা বসলাম। ঘরের তিনদিকে আলমারি বোঝাই পুরোন বই। সামনে টেবিলের উপর নজর যেতে একটা মজার জিনিস দেখলাম। তিনখানা মোটা স্ট্যাম্প অ্যালবাম একটার উপর আরেকটা স্তূপ করে রাখা রয়েছে, আর আরেকটা অ্যালবাম খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে সারি সারি স্ট্যাম্প যত্ন করে আটকানো রয়েছে। কয়েকটা সেলোফেনের মধ্যে কিছু আলগা স্ট্যাম্পও রয়েছে, আর তাছাড়া রয়েছে স্ট্যাম্প কালেক্‌টারদের অত্যন্ত দরকারী ও আমার খুব চেনা কয়েকটা জিনিস—যেমন, হিঞ্জ, চিমটে, স্ট্যাম্পের ক্যাটলগ ইত্যাদি। এখন বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের হাতের ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটাও এই কাজেই ব্যবহার হয়, আর তিনিই এই সব স্ট্যাম্পের কালেক্‌টর।

ফেলুদাও ওই সবের দিকেই দেখছিল, কিন্তু ও নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু কথা হবার আগেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা বৈঠক-খানায় এসে বসুন, মামা এক্ষুনি আসছেন।'

মাথার উপর বিরাট ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা দুজনে সাদা খোলস দিয়ে ঢাকা প্রকাণ্ড সোফার উপর বসলাম। ঘরের চারিদিকে পুরোন বড়লোকী ছাপ। একবার বাবার সঙ্গে বেলেঘাটার মল্লিকদের বাড়িতে ঠিক এইরকম সব আসবাব, পেন্টিং, মূর্তি আর ফুলদানির ছড়াছড়ি দেখেছিলাম। এছাড়া রয়েছে মেঝের উপর একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল, আর দেয়ালে চারটে হরিণ, দুটো চিতাবাঘ আর একটা মহিষের মাথা।

প্রায় দশ মিনিট বসে থাকার পর একজন মাঝবয়সী কিন্তু বেশ জোয়ান গোছের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর রং ফরসা, নাকের তলায় সরু গোঁফ আর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন।

আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক আমাকে দেখে যেন ভুরুটা কপালে তুললেন। ফেলুদা বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই।'

ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফাতে বসে বললেন, 'আপনারা কি দুজনে একসঙ্গে ডিটেকটিভগিরি করেন?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আজ্ঞে না। তবে ঘটনাচক্রে আমার সব ক'টা কেসের সঙ্গেই তপেশ জড়িত ছিল। ও কোন অসুবিধা করেনি কখনো।'

'বেশ।...অবনীশ, তুমি যেতে পারো। এঁদের জন্যে একটু জলযোগের ব্যবস্থা দেখো।'

স্ট্যাম্প-জমানো ভদ্রলোকটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি তাঁর মামার আদেশ শুনে চলে গেলেন। কৈলাস চৌধুরী ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আমার চিঠিটা কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমিই যে প্রদোষ মিত্তির সেটার প্রমাণ চাইছেন তো? এই যে আপনার চিঠি।'

ফেলুদা পকেট থেকে কৈলাসবাবুর চিঠিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল। উনি সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিলেন।

'এ সব প্রিকশন নিতেই হয়, বুঝতেই পারছেন। যাই হোক্—শিকারী বলে আমার একটা নামডাক আছে জানেন বোধ হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঘরের দেওয়ালে জানোয়ারের মাথাগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্র-

লোক বললেন, 'এগুলো সব আমারই শিকার। সতেরো বছর বয়সে বন্দুক চালাতে শিখি। তার আগে অবিশ্যি এয়ার-গান দিয়ে পাখি-টাখি মেরেছি। সম্মুখ সমরে জানোয়ার কোনদিন আমার সঙ্গে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না। কিন্তু....যে শত্রু অদৃশ্য ও অজ্ঞাত—সে আমাকে বড় ভাবিয়ে তোলে।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমার বুকের ভিতরটায় আবার ঢিপ্ ঢিপ্ শুরু হয়েছে। জানি এক্ষুনি ভদ্রলোক রহস্যের কথাটা বলবেন, কিন্তু এত কায়দা করে আস্তে আস্তে আসল কথাটায় যাচ্ছেন যে তাতে যেন সাস্‌পেন্স আরো বেড়ে যায়।

কৈলাসবাবু আবার শুরু করলেন।

'আপনার বয়স যে এত কম তা জানা ছিল না। কত হবে বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'টুয়েন্টি এইট।'

'কাজেই, যে কাজের ভার আপনাকে দিতে যাচ্ছি সেটা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব তা জানি না। পুলিশকে আমি এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না, কারণ এর আগে আরেকটা ব্যাপারে তাদের সাহায্য নিয়ে ঠকেছি। ওরা অনেক সময় কাজের চেয়ে অকাজটা করে বেশি, আর এটাও ঠিক যে আমি তরুণদের অশ্রদ্ধা করি না মোটেই। কাঁচা বয়সের সঙ্গে পাকা বুদ্ধির সমাবেশটা খুব জোরালো হয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

এবারে কৈলাসবাবুর থামার সুযোগ নিয়ে ফেলুদা গলা খাঁকৃরিয়ে বলল, 'ঘটনাটা কি সেটা যদি বলেন.... ।'

কৈলাসবাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তো এটা পড়ে কি বোঝেন।'

ফেলুদা কাগজটা খুলে ধরতে আমি পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে সেটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার মানে হয় এই—'পাপের বোঝা বাড়িও না। যে-জিনিসে তোমার অধিকার নেই, সে-জিনিস তুমি আগামী সোমবার বিকেল চারটার মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের বিশ হাত ভিতর দিকে, রাস্তার বাঁ ধারে লিলি ফুলের প্রথম সারির প্রথম গাছটার নিচে রেখে আসবে। আদেশ অমান্য করার, বা পুলিশগোয়েন্দার সাহায্য নেওয়ার ফল ভালো হবে না—তোমার

অনেক শিকারের মতোই তুমিও শিকারে পরিণত হবে, একথা জেনে রেখো।'

'কী মনে হয় ?' গম্ভীর গলায় কৈলাসবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখে বলল, 'হাতের লেখা ভাঁড়ানো হয়েছে, কারণ একই অক্ষর দুতিন জায়গায় দুতিন রকম ভাবে লেখা হয়েছে। আর, নতুন প্যাডের প্রথম কাগজে লেখা।'

'সেটা কী করে বুঝলেন ?'

'প্যাডের কাগজে লেখা হলে তার পরের কাগজে সে লেখার কিছুটা ছাপ থেকেই যায়। এ কাগজ একেবারে মসৃণ।'

'ভেরি গুড। আর কিছু ?'

'আর কিছু এ থেকে বলা অসম্ভব। এ চিঠি ডাকে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ। পোস্টমার্ক পার্ক স্ট্রীট। তিনদিন আগে এ চিঠি পেয়েছি। আজ শনিবার ২০শে।'

ফেলুদা চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এবার আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আপনার শিকারের কাহিনী ছাড়া আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই আমার।'

'বেশ তো। করুন না। মিষ্টি মুখে পুরে খেতে খেতে করুন।'

চাকর রুপোর প্লেটে রসগোল্লা আর অমৃতি রেখে গেছে। ফেলুদাকে খাবার কথা বলতে হয় না। সে টপ্ করে একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'চিঠিতে যে জিনিসটার কথা লেখা হয়েছে সেটা কি জানতে পারি ?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানেন—যাতে আমার অধিকার নেই, এমন কোন জিনিস কাছে আছে বলে আমার জানা নেই। এবাড়িতে যা কিছু আছে তা সবই হয় আমার নিজের কেনা, না হয় পৈতৃক সম্পত্তি। আর তার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যেটা আদায় করার জন্য কেউ আমাকে এমন চিঠি দিতে পারে। তবে একটিমাত্র জিনিস আছে যেটা বলতে পারেন মূল্যবান ও লোভনীয়।'

'সেটা কী ?'

'একটা পাথর।'

'পাথর ?'

'প্রেশাস স্টোন।'

'আপনার কেনা ?'

'না, কেনা নয়।'

'পৈতৃক সম্পত্তি ?'

'তাও না। পাথরটা পাই আমি মধ্যপ্রদেশে চাঁদার কাছে একটা জঙ্গলে। একটা বাঘকে ধাওয়া করে আমরা তিন-চার জন একটা জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটাকে মারা হয়। কাছেই একটা বহু পুরোন ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরে একটা দেবমূর্তির কপালে পাথরটা লাগানো ছিল। ওটার অস্তিত্ব বোধহয় আমাদের আগে কেউই জানত না।'

'ওটা কি আপনার চোখেই প্রথম পড়ে ?'

'মন্দিরটা সকলেই দেখেছিল, তবে পাথরটা প্রথম আমিই দেখি।'

'সঙ্গে আর কে ছিল সেবার ?'

'রাইট বলে এক মার্কিন ছোকরা, কিশোরীলাল বলে এক পাঞ্জাবী, আর আমার ভাই কেদার।'

'আপনার ভাইও শিকার করেন ?'

'করত। এখন করে কিনা জানি না। বছর চারেক হল ও বিদেশে।'

'বিদেশে মানে ?'

'সুইজারল্যাণ্ড। ঘড়ির ব্যবসার ধান্দায়।'

'যখন পাথরটা পেলেন তখন ওটা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কাড়া-কাড়ি হয়নি ?'

'না। তার কারণ ওটার যে এত দাম সেটা কলকাতায় এসে জহুরীকে দেখাবার পর জানতে পারি।'

'তারপর সে খবরটা আর কে জেনেছে ?'

'খুব বেশি লোককে বলিনি। এমনিতে আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই। দু'একজন উকীল বন্ধুকে বলেছি, কেদার জানত, আর বোধহয় আমার ভাগনে অবনীশ জানে।'

'পাথরটা বাড়িতেই আছে ?'

'হ্যাঁ। আমার ঘরেই থাকে।'

'এত দামী জিনিস ব্যাঙ্কে রাখেন না যে ?'

'একবার রেখেছিলাম। যেদিন রেখেছিলাম তার পরের দিনই একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়—প্রায় মরতে মরতে বেঁচে যাই। তারপর থেকে

ধারণা হয় ওটা কাছে না রাখলে ব্যাড লাক্ আসবে, তাই ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিই।'

'হুঁ...।'

ফেলুদার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ওর ভ্রূকুটি দেখে বুঝলাম ও ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছে। জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমি, আমার ভাগ্নে অবনীশ, আর তিনটি পুরোন চাকর। আর আমার বাবাও আছেন, তবে তিনি একেবারে অথর্ব, জরাগ্রস্ত। একটি চাকর তাঁর পিছনেই লেগে থাকে সারাক্ষণ।'

'অবনীশবাবু কী করেন?'

'বিশেষ কিছুই না। ওর নেশা ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। বলছে একটা টিকিটের দোকান করবে।'

ফেলুদা একটু ভেবে মনে মনে কী জানি হিসাব করে বলল, 'আপনি কি চাইছেন আমি এই পত্রলেখকের অনুসন্ধান করি?'

কৈলাসবাবু যেন একটু জোর করেই হেসে বললেন, বুঝতেই তো পারছেন এই বয়সে এ ধরনের অশান্তি কি ভালো লাগে? আর শুধু যে চিঠি লিখছে তা নয়—কাল রাত্রে একটা টেলিফোনও করেছিল। ইংরিজিতে ওই একই কথা বলল। গলা শুনে চিনতে পারলাম না। কী বলল জানেন? বলল, নির্দিষ্ট জায়গায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জিনিসটা রেখে না এলে একেবারে আমার বাড়ীতে এসে আমাকে ঘায়েল করে দিয়ে যাবে। অথচ এ পাথর হাতছাড়া করতে আমি মোটেই রাজী নই। তা ছাড়া লোকটার যখন কোন ন্যায্য দাবী নেই, অথচ হুমকী দিচ্ছে—তখন বুঝতে হবে সে বদমাইস সুতরাং তার শাস্তি হওয়া দরকার। সেটা কি করে সম্ভব সেটাই আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

'উপায় তো একটাই। বাইশ তারিখে সন্ধ্যাবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকা। তাকে তো আসতেই হবে।'

'সে নিজে নাও আসতে পারে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। যে-ই এসে লিলি গাছের পাশে ঘুরঘুর করুক না কেন, সে যদি আসল লোক নাও হয়, তাকে ধরতে পারলে আসল লোকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হবে না।'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না। লোকটা ডেন্‌জারাস্ হতে পারে। সে যখন দেখবে লিলি গাছের তলায় পাথরটা নেই, তখন সে কী করতে পারে তা বলা যায় না। তার চেয়ে বাইশ তারিখের আগে—অর্থাৎ আজ আর কালের মধ্যে—এই লোকটি কে তা যদি জানা সম্ভব হত তাহলে খুবই ভালো হত। এই চিঠি, আর ওই একটা টেলিফোন কল—এই দুটো থেকে কিছু বার করা যায় না?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। ও বলল, 'দেখুন কৈলাসবাবু, চিঠিতে সে লিখেছে যে, গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল ভালো হবে না—সুতরাং আমি কিছু করি বা না করি, আপনি যে আমাকে ডেকেছেন, এতেই আপনার বিপদের একটা আশঙ্কা আছে। সুতরাং আপনি বরঞ্চ ভেবে দেখুন যে আমাদের সাহায্য চান কিনা।'

কৈলাসবাবু ঠাণ্ডার মধ্যেও রুমাল দিয়ে তাঁর কপাল মুছে বললেন, 'আপনি, এবং আপনার সঙ্গে আপনার ভাইটি—এ দুজনকে দেখলে কেউ মনে করবেন না যে আপনাদের সঙ্গে গোয়েন্দার কোন সম্পর্ক আছে। এটা একটা অ্যাড্‌ভানটেজ। আপনার নাম লোকে জেনে থাকলেও, আপনার চেহারা জানে কি? মনে তো হয় না। সুতরাং সেদিকে আমার বিশেষ ভয় নেই। আপনি রাজী হলে কাজটা নিন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দেবো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তবে যাবার আগে একবার পাথরটা দেখে যেতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

কৈলাসবাবুর পাথর ওঁর শোবার ঘরে আলমারির ভেতর থাকে। আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা শানবাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় পৌঁছলাম। সিঁড়িটা গিয়ে পড়েছে একটা লম্বা, অন্ধকার বারান্দায়। তার দুদিকে সারি দিয়ে প্রায় দশ-বারোটা ঘর তার অনেকগুলো আবার তালাবন্ধ। চারিদিকে একটা থম্‌থমে ভাব আর লোকজন নেই বলেই বোধ হয় সামান্য একটু আওয়াজ হলেই তার প্রতিধ্বনি হয়।

বারান্দার শেষ মাথায় ডান দিকের ঘর হল কৈলাসবাবুর শোবার ঘর। আমরা যখন বারান্দার মাঝামাঝি এসেছি, তখন দেখি পাশের একটা ঘরের দরজা অর্ধেক খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে একজন ভীষণ বুড়ো লোক গলা বাড়িয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে দেখছে। আমার তো

দেখেই কি রকম ভয়-ভয় করতে লাগল। কৈলাসবাবু বললেন, 'উনিই আমার বাবা। মাথার ঠিক নেই। সব সময়েই এখান দিয়ে ওখান দিয়ে উঁকি মারেন।'

কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন বুড়োর চাহনি দেখে সত্যিই আমার রক্ত জল হয়ে গেল! আর সেই ভয়াবহ চাহনি দিয়ে উনি তাকিয়ে রয়েছেন কৈলাসবাবুর দিকে।

বাবার ঘর পেরিয়ে কিছুদূর গেলে পর কৈলাসবাবু বললেন, 'বাবার সকলের উপরেই আক্রোশ। ওঁর ধারণা সকলেই ওঁকে নেগ্‌লেক্ট করে। আসলে কিন্তু ওঁর দেখাশোনার কোন ক্রটি হয় না।'

কৈলাসবাবুর ঘরে দেখলাম প্রকাণ্ড উঁচু খাট, আর তার মাথার দিকে ঘরের কোণায় আলমারি। সেটা খুলে তার দেরাজ থেকে একটা নীল ভেলভেটের বাক্স বার করে বললেন, 'সাতরামদাসের দোকান থেকে এই বাক্সটা কিনে নিয়েছিলুম এই পাথরটা রাখার জন্য।'

বাক্সটা খুলে নীল আর সবুজ রং মেশানো লিচুর সাইজের একটা ঝলমলে পাথর বার করে কৈলাসবাবু ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন—'

'একে বলে ব্লু বেরিল। ব্রেজিল দেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যে খুব বেশি আছে তা নয়। অন্তত এত বড় সাইজের বেশি নেই, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

ফেলুদা পাথরটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক নাড়িয়ে দেখে ফেরত দিয়ে দিল। এবার কৈলাসবাবু তাঁর পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বার করলেন। তারপর তার থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটে আগাম। কাজটা ভালোয় ভালোয় উতরে গেলে বাকিটা দেবো, কেমন?'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফেলুদা নোটগুলো পকেটে পুরে নিল। চোখের সামনে ওকে রোজগার করতে এই প্রথম দেখলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, আপনার ওই চিঠিখানা আমাকে দিতে হবে, অবনীশবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

নিচে যখন পৌঁছলাম, ঠিক সেই সময় বৈঠকখানা থেকে টেলিফোন বাজতে আরম্ভ করেছে। কৈলাসবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরলেন।'

'হ্যালো।'

তারপর আর কোন কথা নেই। আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতেই কৈলাস-বাবু ফ্যাকাশে মুখ করে ধপ্ করে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে বললেন, 'আবার সেই লোক, সেই হুম্‌কি।'

'কি বলল?'

'এবার আর কোন সন্দেহ রাখেনি।'

'তার মানে?'

'বলল—কোন্ জিনিসটা চাইছি বুঝতে পারছ বোধহয়। চাঁদার জঙ্গলের মন্দিরে যেটা ছিল সেইটে।'

'আর কী বলল?'

'আর কিছু না।'

'গলা চিনলেন?'

'না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে গলাটা শুনতে ভালো লাগে না। আপনি বরং আরেকবার ভেবে দেখুন।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে।'

কৈলাসবাবুর কাছ থেকে অবনীশবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে টেবিলের উপর রাখা কি একটা জিনিস খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছেন। আমরা ঢুকতেই টেবিলের উপর হাতটা চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আসুন, আসুন!'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ডাকটিকিটের খুব শখ দেখছি।'

অবনীশবাবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই আমার একমাত্র নেশা। বলতে গেলে আমার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।'

'আপনি কি কোনো দেশ নিয়ে স্পেশালাইজ করেন, না সারা পৃথিবীর টিকিট জমান?'

'আগে সারা পৃথিবীরই জমাতুম, কিন্তু কিছুদিন হল ইণ্ডিয়াতে স্পেশালাইজ করছি। আমাদের এই বাড়ির দপ্তরে যে কি আশ্চর্য সব পুরোন টিকিট রয়েছে তা বলতে পারি না। অবিশ্যি বেশির ভাগই ইণ্ডিয়ার। গত দু'মাস ধরে হাজার হাজার পুরোন চিঠির গাদা ঘেঁটে টিকিট সংগ্রহ করছি।'

'ভালো কিছু পেয়েছেন?'

'ভালো ? ভালো ?' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আপনাকে বললে বুঝবেন ? আপনার এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে ?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'একটা বয়সে তো সকলেই ওদিকটায় ঝোঁকে—তাই নয় কি ? কেপ-অফ্-গুড-হোপের এক পেনি, মরিশাসের দু পেনি, আর বৃটিশ গায়ানার ১৮৫৬ সনের সেই বিখ্যাত স্ট্যাম্পগুলো পাবার স্বপ্ন আমিও দেখেছি। বছর দশেক আগে লাখ খানেক টাকা দাম ছিল ওগুলোর। এখন আরো বেড়েছে।'

অবনীশবাবু উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'তাহলে মশাই আপনি বুঝবেন। আপনাকে দেখাই। এই দেখুন।'

ভদ্রলোক তাঁর চাপা হাতের তলা থেকে একটা ছোট্ট রঙীন কাগজ ফেলুদাকে দিলেন। দেখি খাম থেকে খোলা রঙ প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটা টিকিট।

'কী দেখলেন ?' অবনীশবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'শ' খানেক বছরের পুরোন ভারতবর্ষের টিকিট। ভিক্টোরিয়ার ছবি। এ টিকিট আগে দেখেছি।'

'দেখেছেন তো ? এবার এই গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেখুন।'

ফেলুদা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস চোখে লাগল।

'এবার কী দেখছেন ?' ভদ্রলোকের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'এতে তো ছাপার ভুল রয়েছে।'

'এগ্জ্যাক্টলি !'

'POSTAGE কথাটার G-এর জায়গায় C ছাপা হয়েছে।'

অবনীশবাবু টিকিট ফেরত নিয়ে বললেন, 'তার ফলে এটার দাম কত হচ্ছে জানেন ?'

'কত ?'

'বিশ হাজার টাকা।'

'বলেন কী ?'

'আমি বিলেত থেকে চিঠি লিখে খোঁজ নিয়েছি। এই ভুলটার উল্লেখ স্ট্যাম্প ক্যাটালগে নেই। আমিই প্রথম এটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলাম।'

ফেলুদা বলল, কন্গ্রাচুলেশনস। কিন্তু আপনার সঙ্গে টিকিট ছাড়াও অন্য ব্যাপারে একটু আলোচনা ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার মামা—কৈলাসবাবু—তাঁর যে একটা দামী পাথর আছে সেটা আপনি জানেন?'

অবনীশবাবুকে যেন কয়েক সেকেণ্ড ভাবতে হল। তারপর বললেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছিলাম বটে। দামী কিনা জানি না—তবে 'লাকি' পাথর সেটা একবার বলেছিলেন বটে। কিছু মনে করবেন না। আমার মাথায় এখন ডাকটিকিট ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।'

'আপনি এ বাড়িতে কদ্দিন আছেন?'

'বাবা মারা যাবার পর থেকেই। প্রায় পাঁচ বছর।'

'মামার সঙ্গে আপনার গোলমাল নেই তো?'

'কোন্ মামা? এক মামা তো বিদেশে।'

'আমি কৈলাসবাবুর কথা বলছি।'

'ও। ইনি অত্যন্ত ভালো লোক, তবে…'

'তবে কী?'

অবনীশবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'ক'দিন থেকে—কোনো একটা কারণে—ওঁকে যেন একটু অন্যরকম দেখছি।'

'কবে থেকে?

'এই দু-তিন দিন হল। কাল ওঁকে আমার এই স্ট্যাম্পটার কথা বললাম—উনি যেন শুনেও শুনলেন না। অথচ এমনিতে রীতিমত ইণ্টারেস্ট নেন। আর তাছাড়া, ওঁর কতকগুলো অভ্যেস কি রকম যেন বদলে যাচ্ছে।'

'উদাহরণ দিতে পারেন?'

এই যেমন, এমনিতে রোজ সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করেন, গত দু'দিন করেননি। ঘুম থেকে উঠেইছেন দেরিতে। বোধ হয় রাত জাগছেন বেশি।'

'সেটার কোন ইঙ্গিত পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তো একতলায় শুই। আমার ঠিক উপরের ঘরটাই মামার। পায়চারি করার শব্দ পেয়েছি মাঝ রাত্রে গলার স্বরও পেয়েছি। বেশ জোরে মনে হল ঝগড়া করছেন।

'কার সঙ্গে?'

'বোধহয় দাদু। দাদু ছাড়া আর কে হবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করারও শব্দ পেয়েছি। একদিন তো সন্দেহ করে সিঁড়ির নিচটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম মামা ছাত থেকে দোতলায় নামলেন, হাতে বন্দুক।'

'তখন ক'টা?'

'রাত দুটো হবে।'

'ছাতে কী আছে?'

'কিছুই নেই। কেবল একটা ঘর আছে—চিলেকোঠা যাকে বলে। পুরোন চিঠিপত্র কিছু ছিল ওটায়, সেসব আমি মাস খানেক হল বের করে এনেছি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। বুঝলাম তার আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

অবনীশবাবু বললেন, 'এসব কেন জিজ্ঞেস করলেন বলুন তো।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'আপনার মামা কোনো কারণে একটু উদ্বিগ্ন আছেন। তবে সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি স্ট্যাম্প নিয়েই থাকুন। এদিকের ঝামেলা মিটলে একদিন এসে আপনার কালেকশন দেখব'খন।'

কৈলাসবাবুর সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে ফেলুদা বলল, 'আপনাকে ষোল আনা ভরসা দিতে পারছি না, তবু এটুকু বলছি যে আপনার ভাবনাটা আমায় ভাবতে দিন। রাত্রে ঘুমোতে চেষ্টা করুন, দরকার হলে ওষুধ খেয়ে। আর ছাতে যাবেন না দয়া করে। এ পাড়ার বাড়িগুলো যে রকম ঘেঁষাঘেঁষি, আপনার শত্রু পাশের কোনো বাড়িতে এসে আস্তানা গেড়ে থাকলে বিপদ হতে পারে।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'ছাতে গিয়েছিলাম বটে, তবে সঙ্গে বন্দুক ছিল। একটা আওয়াজ পেয়েই গিয়েছিলাম, যদিও গিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।'

'বন্দুকটা সব সময়ই কাছে রাখেন তো?'

'তা রাখি। তবে মানুষের মনের উদ্বেগ অনেক সময় তার হাতের আঙুলে সঞ্চারিত হয়, সেটা জানেন তো? বেশিদিন এইভাবে চললে আমার টিপের কি হবে জানি না।'

* * *

পরের দিন ছিল রবিবার। সারাদিনের মধ্যে বেশির ভাগটা সময়

ফেলুদা ওর ঘরে পায়চারি করেছে। বিকেল চারটে নাগাত ওকে পায়জামা ছেড়ে প্যাণ্ট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি বেরোচ্ছ ?'

ফেলুদা বলল, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লিলি গাছগুলো একবার দেখে আসব ভাবছি। যাবি তো চ।'

ট্রামে করে গিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের মোড়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে পাঁচটা নাগাত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটটায় পৌঁছলাম। এদিকটায় লোকজন একটু কম আসে। বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকটায় যা লোক আসে সবই সামনের দিকে—মানে, উত্তরে—গড়ের মাঠের দিকে।

গেট দিয়ে ঢুকে বিশ হাত আন্দাজ করে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাঁ দিকে সত্যিই লিলি গাছের কেয়ারি। তার প্রথম গাছটার নিচেই পাথরটা রাখার কথা।

লিলি গাছের মত এত সুন্দর জিনিস দেখেও গা-টা কেমন জানি ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। ফেলুদা বলল, 'কাকার একটা বাইনোকুলার ছিল না—যেটা সেবার দার্জিলিং নিয়ে গেছিলেন ?

আমি বললাম, 'আছে।'

মিনিট পনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঘুরে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেলাম লাইটহাউসের সামনে। ফেলুদার কি সিনেমা দেখার শখ হল নাকি ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিনেমায় না ঢুকে ও গেল উল্টোদিকের একটা বইয়ের দোকানে। এ বই সে বই ঘেঁটে ফেলুদা দেখি একটা বিরাট মোটা স্ট্যাম্প ক্যাটালগ নিয়ে তার পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল। আমি পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, 'তুমি কি অবনীশবাবুকে সন্দেহ করছ নাকি ?'

ফেলুদা বলল, 'এত যার স্ট্যাম্পের শখ, তার কিছুটা কাঁচা টাকা হাতে পেলে সুবিধে হয় বই কি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা যখন দোতলা থেকে একতলায় এলাম, তখন যে টেলিফোনটা এল, সেটা তো আর অবনীশবাবু করেননি।'

'না। সেটা করেছিল মস্‌লন্দপুরের আদিত্যনারায়ণ সিংহ।'

বুঝলাম ফেলুদা এখন ঠাট্টার মেজাজে রয়েছে, ওর সঙ্গে আপাতত আর এ-বিষয়ে কথা বলা চলবে না।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন আটটা বেজে গেছে। ফেলুদা কোটটা

খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমি যতক্ষণ হাতমুখ ধুচ্ছি, তুই ডিরেক্টরি থেকে কৈলাসবাবুর টেলিফোন নাম্বারটা বার কর তো।'

ডিরেক্টরি হাতে নিয়ে টেলিফোনের সামনে বসা মাত্র ক্রিং করে ফোনটা বজে উঠে আমায় বেশ চমকে দিল। আমাকেই ধরতে হয়। তুলে নিলাম রিসিভারটা।

'হ্যালো।'

'কে কথা বলছেন ?'

এ কি অদ্ভুত গলা! এ গলা তো চিনি না! বললাম, 'কাকে চাই ?'

কর্কশ গম্ভীর গলায় উত্তর এল, 'ছেলেমানুষ বয়সে গোয়েন্দার সঙ্গে ঘোরাফেরা করা হয় কেন ? প্রাণের ভয় নেই ?'

আমি ফেলুদার নাম ধরে ডাকতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। কাঁপতে কাঁপতে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার আগে শুনতে পেলাম লোকটা বলল, 'সাবধান করে দিচ্ছি—তোমাকেও, তোমার দাদাকেও। ফল ভাল হবে না!'

আমি কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে রইলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'ও কি—ওরকম গুম মেরে বসে আছিস কেন ? কার ফোন এসেছিল ?'

কোনমতে ঘটনাটা ফেলুদাকে বললাম। দেখলাম ও-ও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'ঘাবড়াস না। লোক থাকবে—পুলিশের লোক। বিপদের কোন ভয় নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল একবার যেতেই হবে কালকে।'

রাত্রে ভালো ঘুম হল না। শুধু যে টেলিফোনটার জন্য তা নয়; কৈলাসবাবুর বাড়ির ভিতরের অনেক কিছুই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই লোহার রেলিং দেওয়া ছাদ পর্যন্ত উঠে যাওয়া সিঁড়ি, দোতলার মার্বেল-বাঁধানো অন্ধকার লম্বা বারান্দা, আর তার দরজার ফাঁক দিয়ে বার করা কৈলাসবাবুর বাবার মুখ। কৈলাসবাবুর দিকে ওরকম ভাবে চেয়েছিলেন কেন তিনি ? আর কৈলাসবাবু বন্দুক হাতে হাতে গিয়েছিলেন কেন ? কিসের শব্দ পেয়েছিলেন উনি ?

ঘুমোতে যাবার আগে ফেলুদা একটা কথা বলেছিল—'জানিস তোপশে —যারা চিঠি লিখে আর টেলিফোন করে হুমকি দেয়—তারা বেশির ভাগ

সময়ই আসলে কাওয়ার্ড হয়।' এই কথাটার জন্যই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত ঘুমটা এসে গেল।

* * *

পরদিন সকালে ফেলুদা কৈলাসবাবুকে ফোন করে বলল তিনি যেন নিশ্চিন্তে বাড়িতে বসে থাকেন ; যা করবার ফেলুদাই করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন যাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ?'

ফেলুদা বলল, 'কাল যে সময় গিয়েছিলাম, সেই সময়। ভালো কথা, তোর স্কুলের ড্রইং-এর খাতা পেনসিল-টেনসিল আছে তো ?

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'কেন তা দিয়ে কি হবে ?'

'আছে কিনা বল না।'

'তা তো থাকতে হবেই।'

'সঙ্গে নিয়ে নিবি। লিলি গাছের উল্টো দিকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তুই ছবি আঁকবি—গাছপালা মেমোরিয়াল বিল্ডিং—যা হয় একটা কিছু। আমি হব তোর মাস্টার।'

ফেলুদার আঁকার হাত রীতিমত ভালো। বিশেষ করে, মাত্র একবার যে-মানুষকে দেখেছে, পেনসিল দিয়ে খস্‌খস্‌ করে মোটামুটি তার একটা পোর্ট্রেট আঁকার আশ্চর্য ক্ষমতা ফেলুদার আছে। কাজেই ড্রইংমাস্টারের কাজটা তার পক্ষে বেমানান হবে না।

শীতকালের দিন ছোট হয়, তাই আমরা চারটের কিছু আগেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পৌঁছে গেলাম। সোমবার ভিড়টা আরো কম। তিনটে পেরামবুলেটারে সাহেবের বাচ্চাদের নিয়ে নেপালী আয়ারা ঘোরা-ফেরা করছে ; একটা পরিবারকে দেখে মারোয়াড়ী বলে মনে হল ; আর তাছাড়া দু'একজন বুড়ো ভদ্রলোক। এদিকটায় আর বিশেষ কেউ নেই। কম্পাউণ্ডের মধ্যেই, কিন্তু গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে চৌরঙ্গীর দিকটায় একটা বড় গাছের তলায় দুজন প্যান্টপরা লোককে দেখলাম, যাদের দিকে দেখিয়ে ফেলুদা আস্তে করে আমায় কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিল। বুঝলাম ওরাই হচ্ছে পুলিশের লোক। ওদের কাছে নিশ্চয়ই লুকোন রিভলভার আছে। ফেলুদার সঙ্গে পুলিশের কিছু লোকের বেশ খাতির আছে, এটা জানতাম।

লিলি ফুলের সারির উল্টো দিকে কিছুটা দূরে খাতা পেনসিল বার করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিলাম। এ অবস্থায় কি আঁকায় মন বসে? চোখ আর মন দুটোই অন্য দিকে চলে যায়, আর ফেলুদা মাঝে মাঝে এসে ধমক দেয়, আর পেনসিল দিয়ে খস্‌খস্‌ করে হিজিবিজি এঁকে দেয়—যেন কতই না কারেক্ট করছে। আমার কাছে থেকে দূরে সরে গেলেই ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখে।

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কাছেই গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। লোকজন কমে আসছে, কারণ একটু পরেই বেশ ঠাণ্ডা পড়বে। মাঁরোয়াড়ীরা একটা বিরাট গাড়িতে উঠে চলে গেল। আয়াগুলোও পেরামবুলেটার ঠেলতে ঠেলতে রওনা দিল। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে আপিস-ফেরতা গাড়ীর ভিড় আরম্ভ হয়েছে, ঘন ঘন হর্নের শব্দ কানে আসছে। ফেলুদা আমার পাশে এসে ঘাসের উপর বসতে গিয়েও বসল না। দেখলাম তার চোখ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের দিকে। আমি সেইদিকে চেয়ে গেটের বেশ কিছুটা বাইরে রাস্তার ধারে একজন ব্রাউন চাদর জড়ানো লোক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না। ফেলুদা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে কিছুক্ষণ ওই দিকে দেখে বাইনোকুলারটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ্।'

'ওই চাদর গায়ে দেওয়া লোকটাকে?'

'হুঁ।'

বাইনোকুলার চোখে লাগাতেই লোকটা যেন দশ হাতের মধ্যে চলে এল, আর আমিও চমকে উঠে বললাম, 'একি—এ যে কৈলাসবাবু নিজে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!'

'হ্যাঁ। চল—নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজতে এসেছেন।'

কিন্তু আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ভদ্রলোক হাঁটতে আরম্ভ করলেন। গেটের বাইরে এসে কৈলাসবাবুকে আর দেখা গেল না।

ফেলুদা বলল, 'চল শ্যামপুকুর। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের দেখতে পাননি, আর না দেখে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।'

ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নিতাম, কিন্তু আপিস টাইমে সেটা সম্ভব নয়, তাই ট্রাম ধরার মতলবে চৌরঙ্গীর দিকে রওনা দিলাম। রাস্তা দিয়ে পর পর লাইন করে গাড়ি চলেছে। হঠাৎ ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে এসে

এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল যেটা ভাবলে এখনো আমার ঘাম ছুটে যায়। কথা নেই বার্তা নেই, ফেলুদা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান মেরে আমাকে ছুঁড়ে রাস্তার একেবারে কিনারে ফেলে দিল। আর সেই সঙ্গে নিজেও একটা লাফ দিল। পরমুহূর্তে দারুণ স্পীডে আর দারুণ শব্দ করে একটা গাড়ী আমাদের প্রায় গা ঘেঁসে চলে গেল।

'হোয়াট দ্য ডেভিল!' ফেলুদা বলে উঠল। 'গাড়ির নম্বরটা....'

কিন্তু সেটার আর কোন উপায় নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্য গাড়ির ভিড়ের মধ্যে সে গাড়ি মিলিয়ে গেছে। আমার হাতের খাতা পেন্সিল কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই, তাই সেটা খুঁজে আর সময় নষ্ট করলাম না। এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা ঠিক সময় বুঝতে না পারলে আমরা দুজনেই নির্ঘাত গাড়ির চাকার তলায় চলে যেতাম।

ট্রামে ফেলুদা সারা রাস্তা ভীষণ গম্ভীর মুখ করে রইল। কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে সোজা বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় বসা কৈলাসবাবুকে ফেলুদা প্রথম কথা বলল, 'আপনি দেখতে পেলেন না আমাদের?'

ভদ্রলোক কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'কোথায় দেখতে পেলাম না? কী বলছেন আপনি?'

'কেন, আপনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাননি?'

'আমি? সে কী কথা! আমি তো এতক্ষণ শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে ভাবনায় ছটফট করছিলুম—এই সবে মাত্র নীচে এসেছি।'

'তাহলে কি আপনার কোন যমজ ভাই আছে নাকি?'

কৈলাসবাবু কিরকম যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'সে কি, আপনাকে সেদিন বলিনি?'

'কী বলেননি?'

'কেদারের কথা? কেদার যে আমার যমজ ভাই।'

ফেলুদা সোফার উপর বসে পড়ল। কৈলাসবাবুরও মুখটা যেন কেমন শুকিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কেদারকে দেখেছেন?'

'উনি ছাড়া আর কেউ হতেই পারেন না।'

'সর্বনাশ!'

'কেন বলুন তো? কেদারবাবুর কি ওই পাথরটার উপর কোন অধিকার ছিল?'

কৈলাসবাবু হঠাৎ কেমন যেন নেতিয়ে পড়লেন। সোফার হাতলে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা ছিল....তা ছিল। কেদারই প্রথম পাথরটা দেখে। আমি মন্দিরটা দেখি, কিন্তু দেবমূর্তির কপালে পাথর কেদারই প্রথম দেখে।'

'তারপর আর কী। একরকম আবদার করেই পাথরটা আমি নেই। অবিশ্যি মনে জানতুম ওটা আমার কাছে থাকলে থাকবে, কেদার নিলে ওটা বেচে দেবে, দিয়ে টাকাটা নষ্ট করবে। আর ওটার যে এত দাম সেটা আমি জেনেও কেদারকে জানাইনি। সত্যি বলতে কি, কেদার যখন বিদেশে চলে গেল, তখন আমার মনে নিশ্চিন্ত ভাব এল। কিন্তু ওখানে হয়ত ও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, তাই ফিরে এসেছে। হয়ত পাথরটাকে নিয়ে বিক্রি করে সেই টাকায় নতুন কিছু ব্যবসা ফাঁদবে।'

একটুক্ষণ চুপ করে ফেলুদা বলল, 'এখন উনি কী করতে পারেন সেটা বলতে পারেন?'

কৈলাসবাবু বললেন, 'জানি না। তবে আমার মুখোমুখি তো একবার তাকে আসতেই হবে। বাড়ি থেকে যখন বেরোই না, আর লিলি গাছের নিচে পাথর যখন রাখিনি, তখন সে আসবেই।'

'আপনি কি চান আমি এখানে থেকে একটা কোন ব্যবস্থা করি?'

'না। তার কোন প্রয়োজন হবে না। সে আমাকে বলার সুযোগ না দিয়ে কিছু করবে বলে মনে হয় না। আর কথাই যদি বলতে আসে, তখলে ভাব। পাথরটা দিয়েই দেব। আপনার কর্তব্য এখানেই শেষ। আপনি যে লাইফ রিস্‌ক করে আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়েছিলেন, তার জন্যে সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি বিলটা পাঠিয়ে দেবেন, একটা চেক আমি দিয়ে দেবো।'

ফেলুদা বলল, 'লাইফ রিস্‌কই বটে। একটা গাড়ি তো পিছন থেকে এসে প্রায় আমাদের শেষ করে দিয়েছিল।'

আমার কনুইটা খানিকটা ছড়ে গিয়েছিল, আমি সেটা এতক্ষণ হাত দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ফেলুদা সেটা দেখে ফেলল।

'ওকি রে, তোর হাতে যে রক্ত!' তারপর কৈলাসবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন—আপনার এখানে একটু ডেটল বা

আয়োডিন হবে কি ? এই সব ঘাগুলো আবার বড্ড চট্ করে সেপ্‌টিক হয়ে যায়।'

কৈলাসবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ইস্—যা হয়েছে কলকাতার রাস্তাঘাট ! দেখি, অবনীশকে জিজ্ঞেস করি।'

অবনীশবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ডেটলের কথা জিজ্ঞেস করতেই উনি কেমন যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি যে এই দিন সাতেক আগেই আনলে। সে কি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল ?'

কৈলাসবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ওহো, তাই তো ! এই ছাখ, খেয়ালই নেই। আমার কি আর মাথার ঠিক আছে ?'

ডেটল লাগিয়ে কৈলাসবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ফেলুদা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ট্রামের দিকে না গিয়ে যাচ্ছে উল্টো দিকে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, 'গণপতিদার কাছে একবার টেস্টম্যাচের টিকিটের কথাটা বলে যাই। এত কাছেই যখন এসেছি....'

কৈলাসবাবুর ছুটো বাড়ি পরেই গণপতি চ্যাটার্জির বাড়ি। আমি ওর নাম শুনেছি ফেলুদার কাছে, কিন্তু দেখিনি কখনো। রাস্তার উপরেই সামনের ঘর, টোকা মারতেই গেঞ্জীর উপর পুলোভার পরা একজন নাত্নসন্নুত্নস ভদ্রলোক দরজা খুলল।

'আরে, ফেলু মাস্টার যে—কী খবর ?'

'একটা খবর তো বুঝতেই পারছেন।'

'তা তো বুঝেছি, তবে সশরীরে তাগাদা না দিতে এলেও চলত। তোমার রিকোয়েস্ট কি ভুলি ? যখন বলেছি দেবো তখন দেবোই।'

'আসার কারণ অবিশ্যি আরেকটা আছে। তোমার বাড়ির ছাত থেকে শুনেছি উত্তর কলকাতার একটা খুব ভালো ভিউ পাওয়া যায়। একটা ফিল্ম কোম্পানীর জন্য সেইটে একবার দেখতে চাইছিলাম।'

'স্বচ্ছন্দে ! সটান সিঁড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি এদিকে চায়ের আয়োজন করছি।'

চারতলার ছাতে উঠে পূর্ব দিকে চাইতেই দেখি—কৈলাসবাবুদের বাড়ি। একতলার বাগান থেকে ছাত অবধি দেখা যাচ্ছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে—আর তার ভিতরে একজন লোক খুট্‌খুট্ করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। খালি চোখেই বুঝতে পারলাম সেটা

কৈলাসবাবুর বাবা। ছাতের ওপর ওই যে চিলেকোঠা—তার জানালার দিকের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে। দরজাটা বোধ হয় উল্টোদিকে।

দোতলার একটা বাতি জ্বলে উঠল। বুঝলাম সেটা সিঁড়ির বাতি। ফেলুদা বাইনোকুলার চোখে লাগাল। একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কে? কৈলাসবাবু। এতদূর থেকেও তাঁর লাল সিল্কের ড্রেসিং গাউনটা দেখেই বোঝা যায়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কৈলাসবাবুকে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ দেখি উনি ছাতে উঠে এসেছেন। আমরা দুজনেই চট্ করে একসঙ্গে নিচু হয়ে শুধু চোখ দুটো পাঁচিলের ওপর দিয়ে বার করে রাখলাম।

কৈলাসবাবু এদিক ওদিক দেখে চিলেকোঠার উল্টোদিকে চলে গেলেন। তারপর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। কৈলাসবাবুকে জানালায় দেখা গেল। ইনি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বুকের ভিতর ভীষণ জোরে টিপ্ টিপ আরম্ভ হয়ে গেছে। কৈলাসবাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাটিতে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর কৈলাসবাবু আবার ঘরের বাতি নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে চলে গেলেন।

ফেলুদা শুধু বলল, 'গোলমাল, গোলমাল।'

ফেলুদার এরকম অবস্থায় আমি ওকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস পাই না। অন্য সময় মাথায় চিন্তা থাকলে ও পায়চারি করে, কিন্তু আজ দেখলাম ও সটান বিছানায় শুয়ে সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে আছে। রাত সাড়ে নটায় দেখলাম ও নোট বইয়ে কী যেন হিজিবিজি লিখছে। ও আবার এসব লেখা ইংরিজি ভাষায় কিন্তু গ্রীক অক্ষরে লেখে, আর সে অক্ষর আমার জানা নেই। এইটুকুই শুধু বুঝতে পারছিলাম যে, কৈলাস-বাবুর বারণ সত্ত্বেও ও এই পাথরের ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমোতে রাত হয়েছিল বলেই বোধহয় সকালে নিজে থেকে ঘুমটা ভাঙেনি—ভাঙল ফেলুদার ঠেলাতে।

'এই তোপশে—ওঠ্ ওঠ্—শ্যামপুকুর যেতে হবে।'

'কিসের জন্য?'

'ফোন করেছিলাম। কেউ ধরছে না। গণ্ডগোল মনে হচ্ছে।'

দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিতে উঠে উধ্বর্শ্বাসে ছুটে চললাম শ্যামপুকুরের দিকে। গাড়িতে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কী সাংঘাতিক লোক রে বাবা! আরেকটু আগে বুঝতে পারলে বোধহয় গণ্ডগোলটা হতো না!'

কৈলাসবাবুর বাড়িতে পৌঁছে ফেলুদা বেল-টেল না টিপেই ভেতরে চলে গেল। অবশ্য দরজাটা যে খোলাই ছিল সেটাও আমাদের ভাগ্য। সিঁড়ি পেরিয়ে অবনীশবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছতেই চক্ষুস্থির। টেবিলের সামনে একটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, আর তার ঠিক পাশেই মেঝেতে হাত দুটো পিছনে জড়ো করে বাঁধা আর মুখে রুমাল বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন অবনীশবাবু। ফেলুদা হুম্‌ড়ি দিয়ে পড়ে আধ মিনিটের মধ্যে দড়ি রুমাল খুলে দিতেই ভদ্রলোক বললেন, 'উঃ—থ্যাঙ্ক গড!'

ফেলুদা বলল, 'কে করেছে এই দশা আপনার?'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে বললেন, 'মামা! কৈলাস-মামা! মামার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—সেদিন বলছিলাম না আপনাকে? ভোরে এসে বসেছি ঘরে—বাতি জ্বালিয়ে কাজ করছিলাম। মামা ঘরে ঢুকেই আগে বাতি নিভিয়েছেন। তারপর মাথায় একটা বাড়ি। তারপর আর কিচ্ছু জানি না। কিছুক্ষণ হল জ্ঞান ফিরেছে—কিন্তু নড়তে পারি না, মুখে শব্দ করতে পারি না—উঃ।'

'আর কৈলাসবাবু?' ফেলুদা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

'জানি না!'

ফেলুদা এক লাফে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও ছুটলাম তার পিছনে।

একবারে বৈঠকখানায় ঢুকে কাউকে না দেখে, তিন ধাপ সিঁড়ি, এক এক লাফে উঠে দোতলায় পৌঁছে ফেলুদা সটান কৈলাসবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। খাটের চেহারা দেখে মনে হল সেখানে লোক শুয়ে ছিল, কিন্তু ঘর এখন খালি। আলমারির দরজা দেখি হাঁ করে খোলা। ফেলুদা দৌড়ে গিয়ে দেরাজ খুলে যে জিনিসটা বার করল সেটা মখমলের সেই নীল বাক্স। খুলে দেখা গেল ভিতরে সেই পাথর যেমন ছিল তেমনিই আছে।

এতক্ষণে দেখি অবনীশবাবু এসে হাজির হয়েছেন, তার মুখের অবস্থা শোচনীয়। তাকে দেখেই ফেলুদা বলল, 'ছাতের ঘরের চাবি কার কাছে?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'সে-সে-সেতো মামার কাছে।'

'তবে চলুন ছাতে'—বলে ফেলুদা তাকে হিড়হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে গেল।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনজনে ছাতে উঠে দেখি—চিলেকোঠার দরজা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ। এইবারে দেখলাম ফেলুদার গায়ের জোর। দরজা থেকে তিন হাত পিছিয়ে কাঁধটা আগিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে চারবার ধাক্কা দিতেই কড়াগুলো পেরেক সুদ্ধ উপড়ে বেরিয়ে এসে দরজাটা ঝটাং করে খুলে গেল।

ভিতরে অন্ধকার। তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ক্রমে চোখটা সয়ে আসতে দেখলাম—এক কোণে অবনীশবাবুরই মত দড়ি বাঁধা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন—ইনি কে? কৈলাস চৌধুরী, না কেদার চৌধুরী?

দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে কোলপাঁজা করে নিয়ে ফেলুদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে কৈলাসবাবুর ঘরে নিয়ে বিছানার উপর শোয়াল। ভদ্রলোক তখন ফেলুদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনিই কি···?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আমারই নাম প্রদোষ মিত্তির! চিঠিটা বোধ হয় আপনিই আমাকে লিখেছিলেন—কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।···অবনীশবাবু, এঁর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দেখুন তো।'

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। ইনিই তাহলে কৈলাস চৌধুরী! ভদ্রলোক বালিশের উপর ভর দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শরীরে জোর ছিল তাই টিকে আছি। অন্য কেউ হলে···এই চার দিনে··· ।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বেশি স্ট্রেন করবেন না।'

কৈলাসবাবু বললেন, 'কিছু কথা তো বলতেই হবে—নইলে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে না। আপনার সঙ্গে আর সাক্ষাত হবে কী করে—যেদিন চিঠি দিলুম আপনাকে, সেইদিনই তো ও আমাকে বন্দী করে ফেলল। তাও চায়ের সঙ্গে ওযুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে—নইলে গায়ের জোরে পারত না।'

'আর সেদিন থেকে উনি কৈলাস চৌধুরী সেজে বসেছিলেন?'

কৈলাসবাবু দুঃখের ভাব করে মাথা নেড়ে বললেন, 'দোষটা আমারই জানেন। বানিয়ে বানিয়ে বড়াই করাটা বোধহয় আমাদের রক্তে একেবারে মিশে আছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনেছিলুম জব্বলপুরের বাজার থেকে। কী দুর্মতি হল, ফিরে এসে চাঁদার জঙ্গলের এক দেব-মন্দিরের গল্প ফেঁদে কেদারকে তাক লাগিয়ে দিলুম। সেই থেকেই ওর ওইটের উপর লোভ। আমার ভাগ্যটা ও সহ্য করতে পারেনি। অনেক কিছুই সহ্য করতে পারেনি। বোধহয় ভাবত—দুজনে যমজ ভাই—চোখে দেখে কোন তফাত করা যায় না, অথচ আমার গুণ, আমার রোজগার, আমার ভাগ্য—এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে এত তফাত হবে কেন? ও নিজে ছিল বেপরোয়া রেক্‌লেস। একবার তো নোট জাল করার কেসে পড়েছিল। আমিই কোন রকমে ওকে বাঁচাই। বিলেত গেল আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে। ভাবলুম আপদ গেল। এই সাতদিন আগে—গত মঙ্গলবার—বাড়ি ফিরে দেখি পাথরটা নেই। তার কথা মনেই হয়নি। চাকরদের উপর চোটপাট করলুম—কোন ফল হল না। বিষ্যুদবার সকালে আপনাকে চিঠি দিলাম সেইদিনই রাত্রে ও এল। বাজারে যাচাই করে জেনেছে ও পাথরের কোন দাম নেই, অথচ ও দেখেছিল লাখ টাকার স্বপ্ন। ক্ষেপে একেবারে লাল। টাকার দরকার—অন্ততঃ বিশ হাজার। চাইল—রিফিউজ করলুম। তাতে ও আমাকে অজ্ঞান করে বন্দী করল। বলল যত দিন না টাকা দিই তদ্দিন ছাড়বে না—আর সে ক'দিন ও কৈলাস চৌধুরী সেজে বসে থাকবে—কেবল আদালতে যাবে না—অসুখ বলে ছুটি নেবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন আপনার চিঠি পেয়ে এসে পড়লাম, তখন ভদ্রলোক একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, তাই আমাদের দশ মিনিট বসিয়ে রেখে একটা হুম্‌কি চিঠি, আর একজন কাল্পনিক শত্রু খাড়া করলেন। এইটে না করলে আমাদের সন্দেহ হত। অথচ আমি থাকলেও বিপদ—তাই আবার টেলিফোনে হুম্‌কি দিয়ে আর গাড়ি চাপা দিয়ে আমাদের হটাতেও চেষ্টা করলেন।'

কৈলাস ভ্রূকুটি করে বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি, কেদার এভাবে হঠাৎ আমাকে রেহাই দিয়ে চলে গেল কেন। আমি তো কাল রাত অবধি ওকে টাকা দিতে রাজী হইনি। ও কি শুধু হাতেই চলে গেল?'

অবনীশবাবু যে কখন দুধ নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন তা লক্ষ্যই

করিনি। হঠাৎ ভদ্রলোকের চীৎকার শুনে চমকে উঠলাম।

'খালি হাতে যাবেন কেন তিনি? আমার টিকিট—আমার মহামূল্য ভিক্টোরিয়ার টিকিট নিয়ে গেছেন তিনি!'

ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে চেয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, 'সেকি—সেটা গেছে নাকি?'

'গেছে বই কি! আমাকে শেষ করে দিয়ে গেছেন কেদার মামা।'

'কত দাম যেন বলেছিলেন টিকিটটার?'

'বিশ হাজার।'

'কিন্তু—' ফেলুদা অবনীশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটা নামিয়ে বলল, 'ক্যাটলগে যে বলেছে ওটার দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়!'

অবনীশবাবুর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার মধ্যেও তো চৌধুরী বংশের রক্ত রয়েছে—তাই না? আপনিও বোধহয় একটু রং চড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন?'

ভদ্রলোক এবার একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললেন, 'কী করি বলুন! তিন বছর ধরে চার হাজার ধূলোমাখা চিঠি ঘেঁটেও যে একটা ভালো টিকিট পেলাম না! তাও তো মিথ্যে বলে লোককে অবাক করে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়!'

ফেলুদা হো হো করে হেসে উঠে অবনীশবাবুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'কুচ পরোয়া নেই। আপনার কেদার মামাকে আপনি যে টাইটটি দিলেন, সেটার কথা ভাবলেই দেখবেন প্রচুর আনন্দ পাবেন। যাক্ গে, এবার দমদম এয়ার পোর্টে একটা টেলিফোন করে দেখি। কেদারবাবু পালাবেন আন্দাজ করে আজ সকালে এয়ার ইণ্ডিয়াতে ফোন করে জেনেছি আজই একটা বোম্বাই-এর প্লেনে ওঁর বুকিং আছে। পুলিশ থাকবে ওখানে, তাই পালাবার রাস্তা নেই! ভাগ্যে তপেশের কনুই ছড়েছিল! ডেটলের ব্যাপারটাতেই আমার ওর উপর প্রথম সন্দেহ হয়।'

কেদারবাবুকে গ্রেপ্তার করতে কোন বেগ পেতে হয়নি, আর অবনীশ-বাবুও তাঁর পঞ্চাশটাকার টিকিটটা ফেরত পেয়েছিলেন। ফেলুদা যা টাকা পেল, তাই দিয়ে আমাদের তিনদিন রেস্টুর‍্যাণ্টে খাওয়া আর দুটো সিনেমা দেখার পরও ওর পকেটে বেশ কিছু বাকি রইল।

আজ বিকেলে বাড়িতে বসে চা খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'ফেলুদা, একটা জিনিস আমি ভেবে বার করেছি, সেটা ঠিক কিনা বলবে?'

'কী ভেবেছিস শুনি।'

'আমার মনে হয় কৈলাসবাবুর বাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে কেদারবাবু কৈলাসবাবু সেজে বসে আছেন, আর সেই জন্যেই সেদিন ওঁর দিকে কটমট করে চাইছিলেন। বাবারা নিশ্চয়ই নিজেদের যমজ ছেলেদের মধ্যে তফাত ধরতে পারে—তাই না?'

'এক্ষেত্রে তা যদি নাও হয়, তাহলেও, তোর ভাবনাটা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে বলে আমি তোকে সম্মানিত করছি'—এই বলে ফেলুদা আমার প্লেট থেকে একটা জিলিপি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

আকাশের আতঙ্ক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আজকালকার খবরের কাগজের দিনে আমরা নিত্যনূতন বিস্ময়কর খবরে শুনতে শুনতে কিরকম মিথ্যা উত্তেজনার মধ্যে যে বাস করি—একদিন যে খবর আমাদের অবাক করে দেয়, পরের দিন আরো বিস্ময়কর ঘটনায় সে খবর কেমন অনায়াসে আমাদের মনে চাপা পড়ে যায়, তার প্রমাণের অভাব নেই।

বেশীদূরে যেতে হবে না। ১৩—সালের বৈশাখ মাসের কথা। খবরের কাগজগুলো একদিন স্যার চিরঞ্জীব রায়ের অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর খুনের মামলা নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলেছিল।

হপ্তাখানেক ধরে খবরের কাগজে আর অন্য কথাই বুঝি ছিল না। সোজা কথা তো নয়। স্বয়ং স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ। স্যার চিরঞ্জীব ইদানীং একটু যেন কেমন অবশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে মস্তিষ্ক-বিকৃতির একটা গুজব চারিধারে শোনা যেতে আরম্ভ করেছিল; কিন্তু তা বলে এতটা কেউ কি কল্পনাও করতে পারতো! তাঁর পূর্বকীর্তির কথা তখনো তো লোকে ভোলেনি! স্যার উপাধির দ্বারা তো তাঁর পরিচয় নয়, তাঁর পরিচয় বাংলার বরপুত্র ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে।

পৃথিবীর শৈশবাবস্থার সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কঙ্কালের খোঁজে মধ্য-এশিয়ায় তিনি যে বৈজ্ঞানিক অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে অভিযানের অসামান্য সার্থকতায় সমস্ত পৃথিবীর কাছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলা থেকে এরকম অভিযান যে হতে পারে, তা কেউ আগে ভাবতে পারেনি।

তাঁর দ্বিতীয় অভিযান প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্যে নিউগিনীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশে। সে অভিযানের ফলে প্রাণিবিদ্যা আশাতীতভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ বুঝি দেখা দেয়। তাঁর অদ্ভুত সব নতুন মতামত শুনে বৈজ্ঞানিক-সমাজ তাঁর মাথা ঠিক আছে কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করে।

স্যার চিরঞ্জীব চিরদিন অত্যন্ত অহংকারী প্রকৃতির। খ্যাতির শিখরে যতদিন তিনি আরূঢ় ছিলেন, ততদিন তাঁর প্রতিভার খাতিরে এ অহঙ্কার সকলে নিঃশব্দে সহ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মানসিক দুর্বলতার পরিচয় যেদিন তাঁর অদ্ভুত কথাবার্তা ও মতামতের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগল, সেদিন কেউ যে আগেকার আক্রোশের শোধ নিতে ছাড়লে না, একথা বলাই বাহুল্য।

কাগজে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করে অনেক প্রবন্ধও বেরুল। প্রাচীন যুগের বিলুপ্ত এক ডাইনোসরের পিঠে চ'ড়ে স্যার চিরঞ্জীব শহরের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই ব্যঙ্গচিত্রটি তখনকার দিনে বিশেষ হাসির খোরাক যুগিয়েছিল। ব্যঙ্গচিত্রটি অকারণে আঁকা হয়নি। বুদ্ধি-ভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে স্যার চিরঞ্জীবের অদ্ভুত এক ধারণা হয়েছিল যে, মেসোজোইক্ যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল বলে বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলিকে লক্ষাধিক বছরের পুরনো মনে করেন, তার সবগুলি নাকি অত পুরনো মোটেই নয়। তিনি নাকি এমন সব ডাইনোসরের হাড় পেয়েছেন, যেগুলিকে আধুনিক কালের বলে নিশ্চিত বোঝা যায়। তা ছাড়া তাঁর মতে সরীসৃপ-বংশ নাকি এখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি।

নানাদিক থেকে আঘাত খেয়ে আহত-অভিমানের জন্যেই কিনা বলা যায় না স্যার চিরঞ্জীব শেষাশেষি একেবারে নিঃসঙ্গই থাকতে আরম্ভ করে-ছিলেন। শহরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁর নির্জন বিশাল বাড়ির পরীক্ষাগারের বাইরে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যেত না।

নিজেকে যেন তিনি সেখানে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কোন কাগজ মজা করার জন্যে বা অনুগ্রহ করে তাঁর যে দু'-একটা লেখা ছাপত, তাতেই তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। সে সমস্ত লেখার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যে মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যেত, তাতে শত্রুপক্ষ হাসলেও অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক-সমাজ এত বড় মনীষীর এমন পতনে বেদনাই অনুভব করতেন।

কিন্তু ঘরে বসে আজগুবি সব ধারণা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা এক কথা, আর মানুষ-খুনের দায়ে আসামী হওয়া আরেক কথা। এ ব্যাপার কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

সে ঘটনার কথা মনে করলেও গা শিউরে উঠে। শুধু সাধারণ হত্যা সে তো নয়, তার ভেতর যে উন্মত্ত পৈশাচিকতার পরিচয় ছিল, তাতেই সকলে বেশী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। স্যার চিরঞ্জীবের নির্জন বাগান-বাড়িতে হঠাৎ একদিন তাঁর একটি ভৃত্যকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণ-ভাবে সে খুন হয়নি। বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অমন নৃশংসভাবে নরহত্যা কেউ করতে পারে না। চাকরটির দু'টি চোখ ওপড়ান এবং তার সর্বাঙ্গের আঘাত দেখে মনে হয়, ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ যেন তার সারা গায়ের মাংস উন্মত্ত-ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে।

স্যার চিরঞ্জীবের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে সবচেয়ে সন্দেহের কারণ এই যে, তাঁকে যখন ধরা হয়, তখন তিনি দমদম থেকে একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে পালাবার চেষ্টা করছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে কাজ না করলে তাঁকে ধরতেই পারত না। এরোপ্লেনে তিনি উঠে বসে চালাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় পুলিশ দ্রুতগামী মোটরে গিয়ে তাঁকে ধরে। পুলিশের আদেশেও প্রথমে তিনি নামতে রাজী না হয়ে তাদের সামনেই প্রপেলার চালিয়ে দিয়ে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ-অফিসার তখন গুলি করে তাঁর প্রপেলার ভেঙে দিয়ে তাঁকে থামায়। এরোপ্লেনে তাঁর সঙ্গে একটি বন্দুকও পাওয়া গিয়েছিল।

এরোপ্লেন থেকে নামবার পরও তাঁর রোখ কমেনি। পুলিশের লোককে যা নয় তাই বলে গাল দিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য জেদ করেন ; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে কিছুই তিনি বলতে চান না। তাঁর চাকরের হত্যা সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পাওয়া

যায়নি। মস্তিষ্ক-বিকৃতির পর তাঁর অহঙ্কারী প্রকৃতি যেন আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, তাঁকে যখন অকারণে ধরে অপমান করা হয়েছে, তখন তাদের কোন কথার আর তিনি জবাব দেবেন না।

এই বিখ্যাত নরহত্যার মামলা আদালতে ওঠার পর কয়েকদিন পর্যন্ত খবরের কাগজগুলোর উত্তেজনার আর অবধি ছিলনা। মানুষের মুখে-মুখেও এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে নানান অতিরঞ্জিত আজগুবি খবর তখন ফিরেছে।

তারপর এই রোমাঞ্চকর হত্যার খবর কোথায় যে গেল তলিয়ে, কেউ তার সন্ধানও রাখলে না। দার্জিলিঙের বিমান-ডাকের ভয়ঙ্কর রহস্য তখন মানুষের মন ও সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে বসেছে। তখন সবে কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ পর্যন্ত এরোপ্লেনে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ডাকবাহী বিমানপোত আশ্চর্যভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘন টেরাই-এর জঙ্গলে ভাঙা এরোপ্লেনটির সন্ধান যদি বা মেলল, তার চালকের কোন পাত্তা নেই। কেমন করে যে এরোপ্লেনটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল, তার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হ'ল না।

শুধু এই ব্যাপারেই শেষ হ'লে হয়ত সাধারণের আতঙ্ক এত বেশী হ'ত না। কিন্তু এ-ব্যাপারে রহস্য আরো গভীর হয়ে উঠল পরের ঘটনায়।

একজন ইংরেজ-বিমানবীর জলপাইগুড়ি থেকে এরোপ্লেনে কলকাতা আসছিলেন তার পরের দিন ভোরের বেলা; কিন্তু যাত্রা করবার খানিক বাদেই তাঁর এরোপ্লেনটিও অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়ে তিস্তানদীর ওপর।

তিস্তার অনেক জেলে নৌকো থেকে তাঁর পড়ার দৃশ্য দেখেছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে, ভোরের আগে আবছা অন্ধকারে তারা চোখে ভাল না দেখতে পেলেও এরোপ্লেনের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ ঊর্ধ্ব-আকাশ থেকে কিরকম বেয়াড়াভাবে এরোপ্লেনটি মাতালের মত পাক খেতে খেতে নামতে থাকে। নীচে নেমেও এরোপ্লেনটি আর একবার ওপরে গোঁত্তা খাওয়া ঘুড়ির মত উঠেছিল, কিন্তু বেশীদূর নয়। তারপর সশব্দে তিস্তার জলে সেটি ভীষণ বেগে এসে পড়ে। এবারে এরোপ্লেনের ভেতর ইংরেজ-চালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সমস্ত মুখ ক্ষতবিক্ষত এবং একটি চোখ খোবলান।

এই ভয়ঙ্কর খবর বাসী হতে না হতেই পরের দিন সংবাদ পাওয়া যায় যে, দার্জিলিং থেকে সন্ধ্যেয় ফেরার সময় আর একটি ডাকবাহী বিমানপোত টেরাই জঙ্গলের ওপর পুবদিকের আকাশ-প্রান্তে ছ'টি অদ্ভুত-আকারের বিমানপোত দেখেছে। ভালো করে লক্ষ্য করার আগেই সেগুলো সন্ধ্যের অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

এই রহস্যময় ছ'টি অজানা বিমানপোতের খবরে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া পড়ে গেল। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, আই. এন. এ. অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ার-ওয়েজে'র কোন এরোপ্লেন সেদিন ওদিকে যায়নি। তা ছাড়া বিমান ডাকের চালক যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল, সে ধরণের বিমানপোত ভারতের কোথাও নেই।

নতুন এই আতঙ্কের হুজুকে চিরঞ্জীব রায়ের মামলা কোথায় চাপা পড়ে গেল, কে জানে। খবরের কাগজের কোণে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লোকের বোধহয় আর চোখেও পড়ে না।

প্রত্যেকে আমরা খবরের কাগজ খুলেই এরোপ্লেন-রহস্যের সংবাদ রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করি; প্রতিদিন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি এ রহস্যের ওপর নতুন কোন আলোক-সম্পাত হ'ল কিনা, তা জানবার আশায়।

হাজার রকমের গুজব ও আলোচনা চারিধারে চলতে থাকে। এই অদ্ভুত অজানা বিমানপোত ছ'টি কাদের? যে ছ'টি এরোপ্লেন আশ্চর্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের ভেঙে পড়ার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? আপাততঃ কোন দেশের সঙ্গে যখন আমাদের কিংবা কারুর যুদ্ধ বা বিরোধ নেই, তখন এমনভাবে কারা নিরীহ আকাশ-পথের যাত্রীদের আক্রমণ করছে? তাদের উদ্দেশ্যই বা কি? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারলে না। শুধু চারিধারে আতঙ্কই বেড়ে যেতে লাগল।

আই. এন. এ. বাধ্য হয়ে বাংলার উত্তরাঞ্চলে রাত্রে এরোপ্লেন চালানো নিষেধ করে দিলে, কারণ দেখা গেল যে বেশির ভাগ দুর্ঘটনা রাত্রে ওই অঞ্চলেই ঘটছে। ডাকবাহী বিমানপোত ও ইংরেজ-চালকের এরোপ্লেনের পর আরো তিনটি এরোপ্লেন ওই অঞ্চলে রাত্রে ভেঙে পড়ে। অধিকাংশ আরোহীর পাত্তা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেও দেখা গিয়েছিল, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন।

শুধু আকাশ-পথের এরোপ্লেনই নয় সাধারণ লোকও আক্রান্ত হয় কেউ

কেউ। রংপুরের একটি গ্রামের রাস্তায় একদিন সকালে একজন চাষীর ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়া যায়। সে তার হারান বলদের খোঁজে রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিল। অনেকে অবশ্য এ-ব্যাপারটির সঙ্গে রহস্যময়-এরোপ্লেন-দু'টির কোন সংশ্রব আছে, তা স্বীকার করতে চান না ; কিন্তু সেই গ্রামের একজন বৃদ্ধ বলে যে, সেদিন রাত্রে আকাশে অদ্ভুত একরকম আওয়াজ সে শুনেছিল।

সত্যি-মিথ্যে নানারকম খবর এইবার রটতে থাকে। হুজুকের দিনে খবরের কাগজগুলো বাচবিচার না করে তার সবগুলোকেই প্রায় স্থান দেয় নিজের পাতায়। আমাদের কাগজের মফঃস্বল-বার্তাগুলো একেই যত গাঁজাখুরি সংবাদের ডিপো। মফঃস্বলের প্রতিনিধিরা সুযোগ পেয়ে যা খুশি আষাঢ়ে-গল্প সেখানে চালাতে লাগল। কোথায় জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এক গাঁয়ে এক বুড়ির একটা বাছুর হারিয়েছে। মফঃস্বল-বার্তায় তার খবরের সঙ্গে বেরুল যে, সে বুড়ি নাকি দেখেছে, আকাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা কি জিনিস নেমে তার বাছুরকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বন্ধু অশোক রায়ের বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

সেদিন সকালবেলা। এই খবরটা হঠাৎ চোখে পড়ায় হেসে উঠে অশোককে বললাম, "খবরটা দেখেছ ? এরপর কোন্‌দিন শুনব, আকাশ থেকে কি একটা নেমে কার হেঁসেল থেকে মাছভাজা চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুক হ'লেই হ'ল !"

অশোক রায় কাগজটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে কিন্তু গম্ভীরমুখেই বললে, "হুঁ, আমি আশ্চর্য হচ্ছি শুধু আই. এন. এ. বা আর কেউ এ সম্বন্ধে কিছু এখনও করছে না দেখে।"

ঠাট্টা করেই বললাম, "বেশ তো তোমার তো নিজেরই প্লেন রয়েছে। তুমিই এ আজগুবি এরোপ্লেনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে লাগ না ?"

ঠাট্টা করে যে কথা বলেছিলাম, অশোক অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তার যা উত্তর দিলে, তা শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

অশোক বললে, "লাগবই তো ঠিক করেছি।"

খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়ে সত্যিই কথা বেরুল না। তারপর অস্ফুটস্বরে বললাম, "তুমি পরিহাস করছ নিশ্চয়ই ?"

"না, পরিহাস নয়, সত্যিই আমি যাব ঠিক করেছি এবং আজই।"

আমি এবার ব্যাকুলস্বরে বললাম, "কিন্তু তুমি সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? এ পর্যন্ত কতজন বৈমানিক মারা গেছে জান? তাদের মধ্যে ওস্তাদ সমস্ত বিমানবীরও ছিল। তুমি তো-সবে সেদিন 'বি' সার্টিফিকেট পেয়েছ। তাছাড়া তোমার প্লেনও ডাকের উড়োজাহাজগুলোর তুলনায় অনেক নীরস।"

অশোক বললে, "বিপদ জেনেই তো যাচ্ছি।"

আমি আর একবার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "বিপদ যে কতখানি, তা কিন্তু বোধহয় বুঝতে পারছ না। এই রহস্যময় এরোপ্লেনগুলো যারা চালাচ্ছে, তারা যেমন পৈশাচিকভাবে নিষ্ঠুর, তেমনি ধূর্ত ও শক্তিমান। আই. এন. এ. কিছু করছে না, এমন তো নয়, তারা দল বেঁধেও কিছু করতে পারছে না এদের বিরুদ্ধে। তারা যেখানে অক্ষম, তুমি সেখানে একলা কি করতে পার?"

অশোককে কিন্তু নিরস্ত করা গেল না, সে শুধু অদ্ভুত একটা উত্তর দিলে, "হয়ত আই. এন. এ.-র চেয়ে আমি এ ব্যাপারের মর্ম বেশী বুঝি। অন্ততঃ কোথায় তাদের দেখা পাব, তা আমি জানি।"

তার কাছ থেকে আর কোন কথা না বার করতে পেরে অবশেষে আমি হতাশ হয়ে বললাম, "নেহাতই যখন যাবে, তখন আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ছিনে!"

অশোক খানিকক্ষণ আমার দিকে নীরবে চেয়ে থেকে বললে, "এ প্রস্তাব আমি তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম।"

সেইদিন দুপুরেই অশোকের প্লেনে আমরা কলকাতা থেকে রওনা হ'লাম। অশোকের প্লেনটি খুব দামী নয়, কিন্তু বেশ মজবুত। টেনেটুনে তাকে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইলও চালানো যায়। সামনে অশোকের ও পেছনে আমার সীট। অশোকের অনুরোধে একটি রাইফেল ও একটি রিভলভার নিয়ে আমায় উঠতে হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটি জিনিস সে যে কেন সঙ্গে আনতে বলেছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি। সেটি একটি লোহার শিরস্ত্রাণ, মধ্যযুগের ধরনে তৈরী। আই. এন. এ. রাত্রে এরোপ্লেন-চালানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সেইজন্যে আমরা ঠিক করেছিলাম —প্রথমে গন্তব্য-স্থানে দিনে পৌঁছে গোপনে রাত্রে কাজ আরম্ভ করব।

গন্তব্য-স্থান অবশ্য আমার জানা ছিল না। উত্তরদিকে যাত্রা করে ঘণ্টা-কয়েক বাদে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরকোটায় পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত জায়গা থাকতে এই শহরটিকে অশোকের বেছে নেওয়ার কারণ তখনও আমি বুঝতে পারিনি!

কিন্তু নাগরকোটার প্রধান অসুবিধা হ'ল এরোপ্লেন নামবার জায়গা নিয়ে। দিনের বেলা নগরের বাইরে যে ফুটবলের মাঠে আমরা নেমেছিলাম, রাত্রে অন্ধকারে সেখানে অবতরণ করা অসম্ভব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দূরের একটি গাঁয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা মাঠ পাওয়া গেল, কিন্তু জোরাল আলোর বন্দোবস্ত করতে না পারার দরুন প্রথম রাত্রে আমাদের কিছু করা হ'ল না। দ্বিতীয় রাত্রে যথাসম্ভব জোরাল দু'টি পেট্রোলের আলো মাঠের দু'ধারে চিহ্ন-হিসেবে রেখে মাঝ-রাতে আমরা আকাশে উঠলাম।

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা কোনদিন বোধহয় ভুলতে পারব না। উত্তেজনার ঝোঁকে এতদূর এগিয়ে এলেও সেই সময় মনে যে একটু দ্বিধা না হয়েছিল, এমন নয়। যে রহস্যময় শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা অভিযান করছি, তাদের নৃশংসতার ও শক্তির পরিমাণ আমাদের অজানা নয়। নিজেদের সামান্য শক্তি নিয়ে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব। মনে হচ্ছিল, এ শুধু গোঁয়াতুর্মি করে মৃত্যুকে ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু নয়; কিন্তু তখন আর পেছুবার সময় নেই।

জয়ষ্টিক টেনে দেবার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে এরোপ্লেন তখন মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। একটি মাত্র ক্ষীণ আশা তখনও মনের মধ্যে আছে — হয়ত সত্যিই আমরা কোন কিছুর দেখা নাও পেতে পারি, কিন্তু সে আশাও সফল হওয়ার নয়।

দেখতে দেখতে এরোপ্লেন কয়েকবার পাক খেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে পড়ল। নাগরকোটা শহরের ক্ষীণ আলো দূরে থাক, আমাদের নামবার মাঠের চড়া আলোও তখন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। যা কিছু আলো আমাদের মাথার ওপর। সেখানে তারায় ভরা আকাশ ঝলমল করছে। শুক্লপক্ষের দশমী না একাদশী তিথির ভাঙা-চাঁদের সামান্য একটু লালচে রেখা পশ্চিমের দিগন্তে দেখা যাচ্ছিল। মাটির ওপর থেকে সে চাঁদ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অনেক উঁচুতে উঠেছিলাম বলে এখনও

তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে রেখাও খানিক বাদে মুছে গেল। তারা-গুলোর আলো ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। নীচের সমস্ত পৃথিবীর ওপর গাঢ় কালির ছোপ। সে ছোপ কোথাও কোথাও বেশী গাঢ়, কোথাও বা একটু ফিকে। সেই সামান্য একটু রঙের তারতম্য থেকেই আমরা মাঠ, গ্রাম ও জঙ্গলকে যথাসম্ভব আলাদা করে ধরতে পারছিলাম।

শহরের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে অশোক. উত্তরের জঙ্গলের ওপর প্লেন চালিয়ে এনেছিল। আমাদের গতি তখন খুব বেশী নয়, ঘণ্টায় আন্দাজ একশ' মাইল বেগে মাটি থেকে হাজার তিনেক ফিট ওপরে আমরা বিশাল বৃত্তাকারে জঙ্গলের ওপর পাক খাচ্ছিলাম। গ্রীষ্মকালে উপযুক্ত বৈমানিকের পোশাক থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের মত যে হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তাতে শীত করছিল। মোটরের গর্জন ছাড়া আর কিছু শব্দ নেই, তারা-খচিত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই।

খানিকক্ষণ বাদে এই একঘেয়েমিতে যেন বিরক্তি ধরে গেল। মোটরের আওয়াজের ভেতর কথা কইবার সুবিধের জন্যে অশোকের ও আমার বসবার জায়গার মধ্যে চোঙ-লাগান রবারের নল আমরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। সেই চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম, "এরকমভাবে কতক্ষণ ঘুরব? এতে লাভই বা কি?"

অশোক চোঙের ভেতর দিয়ে উত্তর দিলে, "অত অধীর হয়ো না। রাত্রে ওড়ার একটা আনন্দ তো আছে!"

আমার কিন্তু এটাকে ঠিক আনন্দ বলে মনে হচ্ছিল না। যাই হোক, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা বলে চুপ করে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে আমরা সেই একভাবে চক্কর দিয়েছিলাম, তা বলতে পারি না। পূবের আকাশ যখন একটু ফিকে হয়ে আসছে প্রভাতের সূচনায়, তখন আমার খেয়াল হ'ল। আবার চোঙের ভেতর দিয়ে বললাম, "সকাল তো হতে চলল। আর কতক্ষণ ঘুরবে এমন করে?"

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব এল, "শীগ্‌গির তোমার শিরস্ত্রাণ পরে ফেলে প্রস্তুত হয়ে বস।"

সত্যি-সত্যিই সেই কথায় ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে ব'য়ে শিউরে দিয়ে গেল।

কম্পিত স্বরে বললাম, "দেখতে পেয়েছ?"

"হ্যাঁ আমাদের দক্ষিণে চেয়ে দেখ। আমি এরোপ্লেনের বেগ বাড়িয়ে আরো ওপরে উঠছি। সেখান থেকে ওদের ছোঁ মেরে পড়তে চাই—অবশ্য যদি ওদের বেগ আমাদের চেয়ে বেশী না হয়।"

এরোপ্লেন হঠাৎ কার্নিক খেয়ে ওপর দিকে নাক তুলে প্রচণ্ড বেগে উর্ধ্বে উঠতে লাগল; সেই মুহূর্তে আমিও দেখতে পেলাম। অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় কিন্তু তারই ভেতর দু'টি বিশাল আবছায়া অদ্ভুত মূর্তি বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

কিন্তু এগুলো কি ধরনের এরোপ্লেন! আমি এরকম এরোপ্লেনের কথা কখন তো শুনিনি। সামনে তার কোন প্রপেলার আছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনেকটা বাদুড়ের ধরনে তাদের দু'ধারে ডানা যে ওঠা-নামা করছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ পদ্ধতিতে কোন এরোপ্লেন যে নির্মিত হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।

এরোপ্লেন-দুটির আকৃতিও অদ্ভুত। অস্পষ্টভাবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে মনে হ'ল কোন সাধারণ প্লেনের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই।

তাদের বেগ বেশী হোক, বা না হোক, আশ্চর্য তাদের ঘোরাফেরার কৌশল। সাধারণ এরোপ্লেনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মোড় ফিরতে হয়, কিন্তু এরা যেন যে কোন জায়গা থেকে যেদিকে খুশি হঠাৎ বাঁক নিতে পারে। সামনে যেতে যেতে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে সোজা পেছনদিকে যাওয়াও এদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

সবেগে এরোপ্লেন চালিয়েও এক কৌশলের জন্যেই কিছুতেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিলাম না। ওপর থেকে তাদের কাছ দিয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে নামবার আগেই তারা অদ্ভুত কৌশলে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল। গুলী করবার মত নাগালের মধ্যে তাদের কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, তারাও বুঝি দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে গুলী চালাতে পারে, কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তারা যেন শুধু কোন রকমে আমাদের প্লেনের লেজের দিকটা আক্রমণ করবার ফিকির খুঁজছে মনে হ'ল।

বন্দুক বা কোন অস্ত্র কেন যে তারা ব্যবহার করেনি, তা অবিলম্বেই

বুঝলাম এবং সেইসঙ্গে সত্যিই আতঙ্কে ওই ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠলাম।

পূবের আকাশ ফিকে হতে হতে তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশের তারা ম্লান আর নীচের মাঠ, গ্রাম, জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমন সময় আমাদের প্লেন তাদের শ'দুয়েক গজের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম—যাদের আমরা এরোপ্লেন ভেবে ছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষের তৈরী কোনপ্রকার যন্ত্র নয়, কল্পনাতীত একরকম প্রাণী—অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যাদের রূপ ভাবা যায় না। আবছা অন্ধকারে তাদের অতিকায় বাদুড়ের মত দেহ ও হিংস্র দাঁতাল মুখের যে আভাস আমি পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে অতীত বা বর্তমানের কোন প্রাণীরই মিল নেই।

নিজের চোখকে প্রথমটা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, ভুল আমার হয়নি। যতই অবিশ্বাস্য হোক, সত্যিই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দু'টি প্রাণীর সঙ্গেই আমাদের আকাশ-যুদ্ধে নামতে হয়েছে।

অশোক নলের ভেতর দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, "কার সঙ্গে লড়তে হবে, এবার বুঝতে পেরেছ?"

আমি বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি আগে থেকেই জানতে?"

উত্তর এল, "না ঠিক জানতাম না বটে, কিন্তু একটু আঁচ করেছিলাম।"

আর আমাদের কোন কথা হ'ল না। কথা কইবার আর সময়ও ছিল না। অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শত্রুদের চেহারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরস্পরকে বাগে পাওয়ার জন্যে তখন আকাশে তাদের সঙ্গে আমাদের প্লেনের অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলেছে; কিন্তু প্রতি-যোগিতায় আমরাই যেন ক্রমশঃ বেকায়দায় পড়ছিলাম, মনে হচ্ছিল।

আমাদের এরোপ্লেনের গতি হয়ত তাদের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাদের ওড়বার কৌশল আমাদের চেয়ে ভালো। আমি-এর মধ্যে কয়েকবার দূর থেকে বন্দুক চালিয়েছি, কিন্তু তাতে কিছু সুবিধে হয়নি। পাখার নানারকম কায়দায় উল্টেপাল্টে তারা শুধু আমাদের এড়িয়েই যাচ্ছিল না, দু'টোতে আমাদের দু'পাশে সরে গিয়ে আমাদের পেছনদিকে আক্রমণ করবার সুযোগ করে নিচ্ছিল।

কিন্তু আক্রমণের কৌশল যে তাদের অমন হবে, আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব-

মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা তা ভাবতে পারিনি। খানিক আগেই একবার সুবিধে পেয়ে আমি তাদের একটির পাতলা চামড়ার ডানাগুলীতে ফুটো করে দিয়েছিলাম। তাতে সে খুব বেশী জখম হয়নি, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর চীৎকার ছেড়েছিল, আমার মোটরের গর্জন ছাপিয়েও তা তীক্ষ্ণভাবে আমাদের কানে এসে বিঁধেছে। আমাদের প্লেন একটিকে পাশে রেখে তাদের আরেকটির শ'দুয়েক ফুট তলা দিয়ে এখন যাচ্ছিল। আমি ওপর দিকে লক্ষ্য রেখে বন্দুকও ছুঁড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে আমাদের প্লেন দুলে উঠে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে প্রচণ্ডবেগে পড়তে শুরু করল। প্লেনের সিটের ধারটা সজোরে সে সময়ে ধরে না ফেললে আমি বোধহয় ছিটকেই পড়ে যেতাম।

হ'ল কি? কি আর হবে। শকুনেরা যেমন করে উঁচু থেকে নামবার সময় পাখা মুড়ে ভারী জিনিসের মত অনেকদূর থেকে দ্রুত বেগে পড়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সেই বিশাল প্রাণীটি আমাদের পেছনের পাখার ওপর এসে পড়েছে। এই সুযোগেরই সে অপেক্ষা করছিল।

প্রথমটা সত্যিই আমি বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম এই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বিপদের ভীষণতায়। হাতের বন্দুকটা তুলে ধরবার কথাও আমার মনে ছিল না। প্লেন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, বিদ্যুদ্বেগে নীচের মাঠ ঘাঠ জঙ্গল আমাদের দিকে ছুটে আসছে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাটিতে আছাড় খেয়ে যখন মরতেই হবে, তখন আর বন্দুক ছুঁড়ে লাভ কি?

কিন্তু সে বিমূঢ়তা আমার কেটে গেল অশোকের কথায়। সে তা হ'লে মাথা ঠিক রেখেছে এত বিপদের ভেতরও! চোঙের ভেতর দিয়ে সে চীৎকার করে বললে, "দেখছ কি? গুলী কর, আমি প্লেন সামলে নিচ্ছি!"

এইবার সামনে আমি ভালো করে চেয়ে দেখলাম। সেদিকে চেয়ে অবশ্য মাথা ঠিক রাখা শক্ত। সামনের ও পেছনের পায়ের হিংস্র-নখরে আমাদের প্লেনের পিছনের দিকটা আঁকড়ে ধরে একটু একটু করে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র দাঁতাল মুখ একেবারে আমার সামনে। জানোয়ারটির বর্ণনা করা কঠিন। অতিকায় একটা গোসাপের সামনের পা-দু'টো থেকে বাদুড়ের মত পাতলা চামড়ার ডানা বেরিয়েছে বললে তার খানিকটা বর্ণনা হয়, কিন্তু তার হিংস্র মুখের ও সাপের মত কুটিল ভয়ঙ্কর চোখের ভীষণতা বোঝান যায় না।

অশোক সামলাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তখন আমাদের প্লেন পেছনের লেজের ভারে টাল হারিয়ে একেবারে মাটির কাছাকাছি এসে পড়েছে। সেই সময়ে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে আমি বন্দুকের নলটা সেই হিংস্র প্রাণীর একেবারে দাঁতালো মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং তারপরই দু'টো ঘোড়াই দিলাম পর পর টিপে।

আর কিছু করবার দরকার হ'ল না। প্লেনের ওপর একবার একটু নড়ে উঠেই জানোয়ারটা গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। আমার বিমানপোতও মাটিতে আছাড় খেতে খেতে হঠাৎ তীরের মত ওপরে উঠে গেল ভারমুক্ত হয়ে।

পূবের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। কপালের ঘাম মুছে আমি চোঙের ভিতর দিয়ে বললাম, "এবার তো নামতে হয়!"

অশোক বললে, "না, আরেকটা যে এখনও বেঁচে আছে।"

"কিন্তু আমার বন্দুক যে সেই জানোয়ারটার সঙ্গে পড়ে গেছে!"

"বন্দুক পড়ে গেছে!"—সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে অশোক খানিক চুপ করে রইলো, তারপর আবার বললে, "তা হ'লেও ফেরা যায় না। এমন সুযোগ আর কখন পাব কিনা সন্দেহ। এই ভীষণ জানোয়ার বেঁচে থাকলে আরো কত সর্বনাশ করবে, কে জানে! তুমি প্যারাসুট দিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত থাক।"

সে কি করতে চায়, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আরেকটি জানোয়ারের নাগাল আমরা তখন ধরে ফেলেছি। চারিদিকে আলোকিত হয়ে ওঠার দরুণ, কিংবা তার সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে কি না, ঠিক বলা যায় না, সে তখন আক্রমণের বদলে পালাবার ফিকিরই খুঁজছে। বিশাল পাখাগুলো সবেগে আন্দোলিত করে পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের দিকেই সে যাওয়ার চেষ্টা করছে মনে হ'ল।

অশোক হঠাৎ চোঙের ভেতর দিয়ে বললে, "লাফিয়ে পড় এইবার।"

কিন্তু লাফাব কি, আমি তখন অশোকের কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের প্লেন সোজা সেই জানোয়ারটির দিকে বন্দুকের গুলীর মত ছুটে চলেছে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে অশোক তার বসবার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এবার শুধু সীটের ধারটুকু ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল, তার ইঙ্গিতে আমিও তখন তাই করছি; তারপর একটি, দুটি, তিনটি সেকেণ্ড। তার ইশারায় এবার হাত ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। প্যারা-

স্যুটের বোতাম টেপবার আগেই শুনতে পেলাম, ওদের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের আওয়াজ। আমাদের এরোপ্লেন প্রচণ্ডবেগে জানোয়ারটিকে আঘাত করেছে।

আমাদের প্যারাস্যুট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একরকম গায়ের পাশ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার মৃতদেহ সশব্দে মাটিতে গিয়ে পড়ল, আমাদের এরোপ্লেনটি মাতালের মত তখন পড়তে পড়তে পাক খাচ্ছে।

নাগরকোটা থেকে ট্রেনে কলকাতায় পৌঁছবার আগেই আমাদের খবর কিরকমভাবে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। এই আশ্চর্য জানোয়ারের মৃত্যুর খবরে সেখানে কি রকম চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, আই. এন. এ. থেকে আমাদের, বিশেষতঃ অশোককে কি রকম সম্মান করা হয়েছিল, সে খবর অনেকেরই জানা।

এখানে শুধু আমাদের এই অভিযানের অদ্ভুত পরিণতির কথাটাই বলব।

সে পরিণতি স্যার চিরঞ্জীবের মুক্তি। শুধু মুক্তি নয়, বৈজ্ঞানিক হিসেবে এই ব্যাপারে তাঁর খ্যাতির পুনরুদ্ধারও হয়ে গেল। প্রাচীন যুগের সরীসৃপ-বংশ যে লোপ পায়নি, তার চাক্ষুষ প্রমাণ তো আমরাই পেয়েছি।

যে ভয়ঙ্কর প্রাণী দু'টিকে আমরা মেরেছিলাম, স্যার চিরঞ্জীব নিউগিনী অভিযান থেকে তাদের ডিম এনে কৃত্রিম উপায়ে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর পরীক্ষাগারে ফুটিয়ে তাদের ছানাগুলোকে পালন করেছিলেন একদিন বৈজ্ঞানিক-জগৎকে দেখিয়ে স্তম্ভিত করে দেবেন বলে। সেগুলো নাকি প্রাচীন যুগের 'টেরোড্যাক্টিলের'ই সুদূর বংশধর—আরো হিংস্র, আরো বিশালকায়। জানোয়ারগুলোও আশাতিরিক্তভাবে বেড়ে ওঠে, কিন্তু এক-দিন হঠাৎ তাঁর চাকরের অসাবধানতায় তাদের খাঁচা থেকে তারা বেরিয়ে পড়ে বলেই বিপদ হয়। চাকরটিকে অমন নৃশংসভাবে তারাই হত্যা করেছিল।

তারা ছাড়া পেয়ে কি সর্বনাশ করতে পারে, তা বুঝেই স্যার চিরঞ্জীব বন্দুক নিয়ে এরোপ্লেনে তাদের মারবার জন্যে বেরোচ্ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সেই অবস্থায় বাধা দেওয়ায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে তিনি একেবারে মৌন হয়ে যান।

খবরের কাগজে যে সংবাদ একদম চাপা পড়ে গিয়েছিল, অশোক স্যার চিরঞ্জীবের সেই খুনের রহস্যের সঙ্গে এই বিমান-ডাকের রহস্যের যোগসূত্র হঠাৎ একদিন আশ্চর্যভাবে আবিষ্কার না করলে অবশ্য সব দিক দিয়েই

সর্বনাশ হয়ে যেত। আর মফঃস্বল সংবাদে বুড়ির বাছুর-চুরির যে খবর গাঁজাখুরি বলে আমি পরিহাস করেছিলাম, তার থেকেই কিন্তু জানোয়ার দু'টিকে কোথায় সন্ধান করতে হবে, অশোক তার আভাস পায়। নইলে নাগরকোটার নামও সে জানত না দু'দিন আগে।

একটি চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী

সুকুমার দে সরকার

নিজের নাম নিয়ে শেষে এমন মুস্কিলে পড়ব কে জানত? শেক্সপিয়র বলে গেছেন নামেতে কি আসে যায়। আমার মামা আমার বেলায় মহাপুরুষের সেই মহাকাব্য প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ যে কোন বিশেষ্য বা বিশেষণ যা তাঁর বেশ লাগসই মনে হয় তা তিনি আমার ওপর লাগিয়ে বসেন। তাই তাঁর কাছে কখনও আমি পেঁচা কখনও গরু কখনও ভাল্লুক আবার কখনও দোল-গোবিন্দ বলেও আখ্যাত হই। আমার মেসোমশায়ের কিন্তু অন্য মত—তিনি আবার মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্! তিনি বলেন নামের ওপরেই এক এক জনের মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে—নামই সব। বাপ মা যা নাম দেয় সে সব ভুল, তার ভেতর থেকে চরিত্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না, তাই যে সব লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন, তাদের সকলকে তিনি নিজে এক একটা নাম দেন। আমার কপালে জুটেছিল—হরির লুঠ।

তারপরে আমার পিসেমশাই। তিনি অত যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না। তাঁর পরিচয় তোমরা শিগ্‌গিরই পাবে, তবু আগে থাকতে এটুকু জেনে রাখ যে তিনি রসগোল্লা খেতে অত্যন্ত ভালবাসেন আর রসগোল্লা কথাটা সব সময়ে তাঁর মুখে লেগে আছে। আমার পিসেমশাই পয়সাওয়ালা লোক, কিন্তু তেজারতি ব্যবসা করে তাঁর প্রকৃতিটা বেশ কৃপণ হয়ে উঠেছিল। সদানন্দ রোডে প্রকাণ্ড এক পাঁচ তলা বাড়ির ফ্ল্যাটে থাকতেন। মোটের ওপর চলছিল ভাল কিন্তু গোলমাল বাধালে একছড়া প্রকাণ্ড মোটা সেকেলে সোনার বিছে হার।

সেদিন সকালে তখন সবে বিছানায় উঠে বসেছি হঠাৎ মামা হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন—এই দেখ, ঠিক যা ভেবেছি, পেঁচাটা ঘুমোচ্ছে।

—কই মামা, ঘুমোচ্ছি কোথায়, এই তো উঠে বসে আছি।

—তবে তো খুব কাজ করেছ। নে নে চল।

—কোথায় ?

—শুনিসনি ? তোর পিসেমশায়ের বাড়ি যে ভীষণ চুরি হয়ে গেছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ রে ভাল্লুক। চল শিগ্‌গির চল।

একবার মামার দোকানের একটা মুক্তোর মালা চুরির চোর ধরায় সাহায্য করেছিলাম বলে মামার কাছে আজও আমার খুব খাতির। আমার মামা জুয়েলার আর পিসেমশাই তেজারতি করেন, তাই ওঁদের দুজনের মধ্যেও খুব খাতির।

মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম—পথে যেতে যেতে মামা আমাকে চুরির সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন।

পিসেমশায়ের বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে তেতলায় সম্প্রতি এক বেহারী ভদ্রলোক ভাড়াটে এসেছেন। কাল রাত্রে সেই ভদ্রলোক পিসেমশায়ের কাছে এসে বলেন—বাবুজি আমি নূতন কলকাতায় এসে টাকার অভাবে বড় বিপদে পড়ে গেছি, শুনলাম আপনি টাকা ধার দেন, তা আমার এই হারটা বাঁধা রেখে যদি আপনি পাঁচশো টাকা ধার দেন তো বড় উপকার হয়।

অবশ্য কথাগুলো সব হিন্দিতেই হয়েছিল। পিসেমশাই হারটা পরীক্ষা করে দেখলেন একেবারে পাকা সোনার দামী হার। তবু বললেন—আপনি কাল আমার দোকানে আসবেন—দিয়ে দেব।

তখন সে ভদ্রলোক বললেন—বাবুজি, আমার হাতে একটাও পয়সা নেই, আজই যদি আপনি দেন তো বিশেষ উপকার হয়। এখন, সেদিন কি কারণে পিসেমশায়ের হাতে টাকা ছিল, তিনি হারটা নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেন। তারপরে হারটা তাঁর সেকেলে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে যথারীতি কাজটাজ সেরে তিনি শুয়ে পড়েন। লোহার সিন্দুকটা থাকত পিসীমার ঘরে, পিসীমা কিছুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। পিসেমশায়ের শোবার ঘর তার পাশে। সকাল বেলা তিনি উঠে দেখেন পিসীমার ঘরের

বারান্দার দিকের দরজা খোলা। তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়। উঠে এসে দেখেন সেকেলে লোহার সিন্দুকের ডালা ভাঙা পড়ে আছে, ভেতরে কিছু নেই। আর বারান্দা থেকে বাঁধা একটা লম্বা দড়ি নিচে মাটিতে ঝুলছে। সিন্দুকে আর কিছু বিশেষ ছিল না, কিছু টাকা আর সেই হারটা। সব উধাও। পিসেমশাই প্রথমে টেলিফোন করে মামাকে আনান, তারপরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে সব লিখেটিখে নিয়ে বলে যে এই রকম সিন্দুক ভাঙা চুরি কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু চোরকে তারা কিছুতেই ধরতে পারছে না।

এই তো গেল সংক্ষেপে ব্যাপার, তারপরেই মামা আমার কাছে আসেন। পিসেমশায়ের ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ন'টা হবে। বাড়িতে ঢোকবার প্যাসেজের সামনেই রামসিং দারোয়ানের ঘর। ফ্ল্যাট হিসেবে ভাড়া দেওয়া কিনা তাই রামসিং বাড়ির তাঁবেদারি করে। আমাদের দেখে রামসিং বেরিয়ে এল। ইয়া তাগ্‌ড়া লম্বা চেহারা, বুক পেট সব সমান গোল, আর মুখে বিশাল এক ঝাড়ুদারি গোঁফ। মামাকে দেখে রামসিং বলল—কি বাবুজি, ডাকু পাকড়াবার জন্যে কি এই খোঁকাবাবুকে নিয়ে এলেন নাকি?

মামা বললেন হ্যাঁ।

রামসিং হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে আমার কাঁধে তার বিশাল হাতটা বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে ধরে—তেমনি করে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—খোঁকাবাবু পালোয়ান, ডাকু পাকড়কে লিয়ে আসবে।

রামসিং আবার হো হো করে হেসে উঠল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তবু রামসিং-এর চোখে একটা অদ্ভুত লোভী আলো দেখে চুপ করে গেলাম। এরকম ব্যাপারে যত চুপ করে দেখা যায় ততই ভাল।

ওপরে গিয়ে দেখি পিসেমশাই একটা ইজি চেয়ারে উদাস হয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখেই হাউমাউ করে উঠলেন—এই দেখ রসগোল্লাটা এই সময় জ্বালাতে এসেছে, আমি মরছি আর এখন হল ওর মজা দেখবার সময়! ওরে উঃ আমার বুক কেমন করছে!

মামা বললেন—ওরকম করছ কেন? চুপ কর।

—চুপ করব? আমার মান-সম্মান সব গেল। দেওনারায়ণের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

দেওনারায়ণ সেই বেহারী ভদ্রলোকের নাম।

মামা বললেন—কি আর হয়েছে, না হয় টাকাটা তুমি দিয়ে দেবে—

"অ্যাঁ! ওরে বাবা হা—জা—র টাকা!" পিসেমশাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে আমার বুক কেমন করছে, বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে। ওরে রসগোল্লা, ডাক্তার ডাক।"

আমি মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বললেন—যা রে শুঁট্‌কি মাছ, তোর মেসোমশাইকে একবার খবর দে।

মেসোমশাই আত্মীয়দের সকলেরই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ন—ভিজিটটা বেঁচে যায় কি না!

একটু পরে হুমদাম করে এসে মেসোমশাই ঘরে ঢুকলেন। কাঁধে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি। আমরা তো অবাক! জিগ্যেস করলাম—ওতে কি মেসোমশাই?

—কমলালেবু।

—কমলালেবু কি হবে?

—উঃ উঃ কি বোকা! নে! কমলালেবু কি হয়? নে নে একটা খেয়ে দেখ কি হয়।

—তা তো জানি কিন্তু নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন এর মানে কি? ওগুলো পিসেমশায়ের জন্যে বুঝি?

অ্যাঁ? না, না, বুকের ব্যামো, ও লেবু খাবে কি? আর নিচে গাড়িতে রেখে আসার কি জো আছে? ড্রাইভারটা যদি খেয়ে নেয়।

ভেবে দেখ তোমরা, প্রকাণ্ড মাস্টার বুইকে যিনি ঘুরে বেড়ান তাঁর ভয় একটা লেবু যদি ড্রাইভার খেয়ে নেয়। আবার জিগ্যেস করলাম—তা লেবু খেলে তো শুনেছি হার্ট শক্ত হয়, পিসেমশায়ের বেলা কি সে নিয়ম খাটে না?

—অ্যাঁ? আচ্ছা দে আধখানা।

তারপরে পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন—এইবার বলত টেঁশুরাম, কেমন আছ?

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—টেঁশুরাম কাকে বলছ?

—কেন, তোমাকে! আমি ভেবে দেখলাম ওই নামটাই তোমার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার মানায়। একেবারে খাপে খাপ বসে যায়, কি

বলিস রে হরির লুঠ ?—আমার দিকে ফিরে মেসোমশাই বললেন।

আমাকে আর উত্তর দিতে হল না। পিসেমশাই তখন উঠে বসেছেন, তাঁর বুকের ব্যথা কখন ভাল হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন—আমি টেঁশুরাম ? তা হলে তুমি—একটা (পিসেমশাই খুঁজতে লাগলেন)······তুমি একটা রসগোল্লা !

—খামোখা কেন রাগ করছ ?···মেসোমশাই বললেন। তারপরে মামার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা তুমি বল গদাধর।

—গদাধর কাকে বলছ ?—বাজখাঁই গলায় উত্তর এল।

—কেন, তোমাকে ! ওটা তোমার নাদা পেটের সঙ্গে যা মানায়—চমৎকার !

—কি ? কি বললে, আমার নাদা পেট ?

তারপরে যা কাণ্ড শুরু হল ঘরের ভেতর সে আর বলবার নয়। কাকে রেখে কাকে সামলাই ? ঘরের ভেতর যেন কথার কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। আমি শেষে চটেমটে বললাম—তোমরা তা হলে এই করতে থাক, আমি চললাম।

রাগ করে পথে নেমে এলাম। তিনজন বয়স্ক লোক—তাঁদের একি কাণ্ড ! সকাল বেলাটাই আমার নষ্ট হল দেখছি। হঠাৎ পেছন থেকে পিসেমশায়ের চীৎকার শুনলাম—এই রসগোল্লা !

সঙ্গে সঙ্গেই মেসোমশায়ের ডাক—হরির লুঠ ! দেখি সামনের বারান্দায় পিসেমশাই আর মেসোমশাই দুজনেই বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকছেন।

—রসগোল্লা !

—হরির লুঠ !

—রসগোল্লা !

—হরির লুঠ !

কি আর করি—ফিরলাম। কিন্তু একি বিপদ ! আমার পেছু পেছু এত লোক আসে কেন ? দেখতে দেখতে পথটা লোকে ভরে গেল আর সবাই পিসেমশায়ের বাড়ির সামনে এসে জড় হল। একজন হেঁকে বলল—কই মশাই, রসগোল্লা হরির লুঠ কোথায় ?

পিসেমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন—না, সে আপনাদের নয় মশাই,

ওই ওকে!

—কেন, আমরা বুঝি খেতে জানি না? হরির লুঠ দেবেন তার আবার একে ওকে কি?

মেসোমশাই আমাকে ডাকলেন—এই হরির লুঠ!

—কই মশাই, কই? শুধু শুধু লোককে মিথ্যে কথা বলেন কেন?

—আপনাদের বলছি না মশাই।

—বলছেন না কি রকম, হরির লুঠ বলে আকাশ ফাটিয়ে ফেলেছেন আর আসলে শূন্যি?

কতক্ষণ এরকম চলত বলা যায় না কিন্তু সব থেকে বাঁচালেন মামা, আমার ওপর মামার জীব-জগতের জ্ঞান প্রয়োগ এত দিনে দেখলাম সার্থক হল। মামা হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমাকে হেঁকে বললেন—এই ডালকুত্তা, তেড়ে যা না, হাঁ করে দেখছিস কি?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল—অ্যাঁ, ডালকুত্তা? তারপরেই সব হাওয়া।

ওপরে এসে বললাম—তোমরা কি সারাদিন আজ এই করবে, না চুরির ব্যাপারে কিছু বলবে?

মামা বলল—ব্যাপার আর কি বলবার আছে। একটা চোর দড়ি দিয়ে বেয়ে এই বারান্দায় উঠেছে, কোন যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে, তারপরে সিন্দুক ভেঙে লোপাট।

পিসেমশাই শুধু একবার হাউ-মাউ করে উঠল।

আমি বললাম—যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে কি করে জানলেন?

—প্রথম, যে চোর সিন্দুক ভাঙতে পারে সে দরজাও ভাঙতে পারে; দ্বিতীয়, দরজায় একটা নতুন বড় করে ছেঁদা করা হয়েছে।

—আচ্ছা পিসেমশাই, আপনার সেই ভদ্রলোক সেই হারটার কথা বা টাকার কথা ওই রামসিং দারোয়ানকে বলেছিল কিনা জানেন?

—না, তা তো জানি না, তবে ডেকে জিগ্যেস করতে পারি।

—হ্যাঁ, করুন না একবার।

দেওনারায়ণবাবুকে ডেকে আনা হল।

মামা বলল—এই প্যাঁচা, কি জিগ্যেস করবি তুই কর।

আমি জিগ্যেস করলাম—আচ্ছা, আপনি আপনার হারটা কি রাম-

সিংকে দেখিয়েছিলেন বা বন্ধকের কথা বলেছিলেন ?

ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পিসে-মশাই বললেন—ও উনি আবার ভাল বোঝেন না সব। আচ্ছা আমি জিগ্যেস করছি।

অনেকক্ষণ ইকড়ি মিকড়ি করার পর জানা গেল হারটার কথা দেওনারায়ণবাবু রামসিংকেও বলে ছিলেন দেখিয়েও ছিলেন এবং বন্ধক দিয়ে যে টাকা নিয়েছিলেন সে কথাও বলেছিলেন। এক দেশের আর এক ভাষায় লোকের কাছে অত লুকোচুরি করবার দরকার মনে করেননি।

দেওনারায়ণবাবু চলে গেলে মামা বলল—রামসিং-এর কথা জিগ্যেস করছিস কেন ?

আমি বললাম—হারটার কথা দু'জন লোকের মোটে জানবার কথা, এক—দেওনারায়ণ, দুই—পিসেমশাই ; তৃতীয় যদি কেউ জানে তাহলে সন্দেহটা তার ওপর পড়ে। এখন এটা সাধারণ চোরের কাজ নয়, কারণ ঠিক হারটা যেদিন রাখা হল চুরিও সেদিনই হল। এর মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে। এ কোন জানা চোরের কাজ।

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—ঠিক হয়েছে। নিশ্চয়ই ওই ব্যাটা রামসিং নিয়েছে। আমার এখানে যে আর কিছু থাকে না, সব দোকানে থাকে, ও জানে। কাল শুনেছে হারটা ওখানে রেখেছি, ব্যাটা দড়ি বেঁধে ওপরে উঠেছে, তারপর দরজা কেটে সিন্দুক ভেঙে চুরি করেছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি ব্যাটাকে।

—দাঁড়ান দাঁড়ান পিসেমশাই—এখন নয়।

—কেন ?

—আগে ভাল করে দেখা যাক। চলুন তো বারান্দাটা একবার দেখা যাক।

—বারান্দায় এসে আমি বললাম—দড়িটা কোথায় গেল ?

—পুলিশে নিয়ে গেছে।

—দড়িটা কোথায় বাঁধা ছিল ?

মামা আর পিসেমশাই দেখিয়ে দিলেন, মেসোমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেবু খেতে লাগলেন।

বাড়িটা প্রকাণ্ড লম্বা—সামনে দু'সার ছোট ছোট ব্যালকনি ওপরে

উঠে গিয়েছে, আমাদের মাথার ওপর আমাদের মতই ব্যালকনি আরও চারটে ওপরে উঠে গেছে। ব্যালকনিগুলো ঢালাই করা, তার ওপর বালির কাজ। দেখলাম যেখানে দড়িটা বাঁধা ছিল বলে ওঁরা দেখিয়ে দিলেন সেখানে কোন দাগ নেই—চুনবালির ওপর কোন রকম দাগ পড়েনি। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

সেদিন আর কিছু হল না, চলে এলাম। মনটা চিন্তিত হয়ে রইল। পথে যেতে যেতে ভাবলাম একটা লোক দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল অথচ রেলিং-এর চুনবালিতে কোন দাগ পড়ল না? লোকটা কি পাখির মত হাল্‌কা নাকি? লোকটা দড়ি বেঁধে তো উঠেও এসেছে, তাতে চুনের ওপর অনেক ঘষা লাগবার কথা। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা কথা মনে চমকে গেল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম চোর দড়ি বেঁধে ওপরে উঠে চুরি করেছে। বারান্দায় দড়িটা বাঁধা ছিল। কিন্তু চোর নিচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ি বাঁধল কি করে? চোরের তো আর পাখা থাকতে পারে না। আর থাকলে সে দড়ি ব্যবহার করবে কেন? হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!

সন্ধ্যেবেলা আবার পিসেমশায়ের ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ি অন্ধকারে কুপ কুপ করছে। সিঁড়ির মুখে রামসিংকে কারণ জিগ্যেস করলাম—এত অন্ধকার কেন?

—ডাকু পকড়নেকা সুবিস্তা হোগা আপকা খোঁকাবাবু—রামসিং হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে বলল—নেই খোঁকাবাবু বিজলী লাইন ফিউজ হো গিয়া, মিস্ত্রি আতা হ্যায়।

আর কিছু না বলে ওপরে উঠতে লাগলাম। হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে লাগল ঠোক্কর কার সঙ্গে। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—কি মশাই, দেখতে পান না? অন্ধ নাকি?

একটা কড়া জবাব দিতে যাব হঠাৎ লোকটা প্রায় ছুটে নেমে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কে লোকটা, অমন করে পালাল কেন? তাড়াতাড়ি পিসেমশায়ের ঘরে ঢুকতেই পিসেমশাই বলে উঠলেন—কি রে রসগোল্লা, কি মনে করে?

—দাঁড়ান, বলে বারান্দায় গিয়ে দেখি বাড়ি থেকে দেওনারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা একবার সন্দিগ্ধভাবে উপরে তাকাল তারপরে

হন হন করে পা চালিয়ে দিলে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ওর সঙ্গেই যে আমার ধাক্কা লেগেছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু ও নাকি বাংলা জানে না? এ লুকোচুরির মানে কি? প্রথমতঃ ও মিথ্যে কথা বলেছে বাংলা জানে না বলে, দ্বিতীয়তঃ বাংলা বলে ফেলে ও ওরকম লুকিয়ে পালাতে চাচ্ছে—এর মানে কি? আর হঠাৎ সত্যিটা মনে চমক দিয়ে গেল।

হারটার কথা তিনজন জানত। পিসেমশাই, দেওনারায়ণ আর রামসিং। এখন রামসিং নিচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ি বাঁধতে পারে না। পিসেমশায়কে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তাহলে থাকে দেওনারায়ণ। সে তার বারান্দা থেকে দড়ি বেঁধে নেমে এসে হারটা চুরি করেছে তারপরে ওঠবার সময় দড়ির নিচের দিকটা পিসেমশায়ের বারান্দায় বেঁধে আবার ওপরে উঠে গেছে। তারপর নিজের বারান্দা থেকে দড়িটা খুলে একেবারে নিচে ফেলে দিয়েছে। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। তার দু'রকম লাভ—টাকাটাও হারটাও। আর তাই আমরা নিচের বারান্দায় কোনরকম দড়ির দাগ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে ভেতরে এলাম—পিসেমশাই, আপনার থানার ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে ভাব আছে?

—কোন্ ইন্‌স্পেক্টর?

—যে এই চুরির ভার নিয়েছে।

—না, তবে তোর মামার সঙ্গে তার ভাব আছে।

—তবে ডাকুন মামাকে।

আধঘণ্টা পরে মামা এসে বলল—কি রে গরু, আবার কি খেয়াল?

—মামা, ইন্‌স্পেক্টরকে একটা খবর দিতে হবে। খবরটা ঠিক কি না জানি না, তবে মনে হয় আমার সন্দেহ ঠিক।

—খবরটা কি?

পিসেমশাই বললেন—রসগোল্লা।

—অ্যাঁ, রসগোল্লা? সে আবার কি?

—আঃ, তোমরা আবার শুরু করো না—আমি বললাম, দাঁড়াও সব বলছি।

সেই রাতেই ইন্‌স্পেক্টর বিজয়লালবাবু এসে দেওনারায়ণকে বললেন

—বাবুজি, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, একবার আসতে পারি ?

—জরুর। দেওনারায়ণ জবাব দেয়।

আমরা বিজয়লালবাবুর পেছনে পেছনে ভেতরে যাই এবং কোন কথা না বলে একেবারে বারান্দায় গিয়ে হাজির হই। বেশি খুঁজতে হয় না, বারান্দার চুনবালির রেলিংএর হাতলে গোল করে কাটা দাগ। বিজয়লালবাবু হেসে ওঠেন, তারপরে আমাকে বললেন—সাবাস ভায়া ! ওই দড়ির দাগ, ওইখান দিয়ে ও নিচে নেমেছিল।

পিসেমশায় লাফিয়ে ওঠেন—উঃ উঃ, সাহস দেখেছ ! হতভাগাকে জেলে দেব ! হতভাগা একটা···একটা....রসগোল্লা। আমরা ভেতরে আসি, আর আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—দেওনারায়ণ কোথায় ?

—অ্যাঁ ? পিসেমশাই বললেন।

—পালিয়েছে। বললে মামা।

বিজয়লালবাবু হাসেন—এইটাই হল বোঝার উপর শাকের আঁটি। লোকটা চালাক হয়েও বোকা, ভেবেছে পালিয়ে রেহাই পাবে, ওর ওই পালানটাই ওর বিরুদ্ধে শেষ প্রমাণ। তবে বাছাধনকে যেতে হবে না বেশি দূর। নিচে আমার লোক এমনি সাধারণ পোশাকে খাড়া আছে, যতক্ষণ আমি ওপরে থাকব ততক্ষণ কেউ পালাতে পারবে না।

তারপরে ? আরও শুনতে চাও ? দেওনারায়ণ ধরা পড়ল, বামাল পাওয়া গেল। শুধু পিসেমশায়েরটা নয়, আরও অনেকের। লোকটা বেহারী মোটেই নয়, একটা পাকা বাঙালী চোর। নানা জায়গায় নানারকম সেজে চুরি করেছে। সিন্দুক ভাঙায় লোকটা একেবারে পাকা। তারপর তার দুঃখের কাহিনী আর নাই বা শুনলে।

এসবের পর অনেকদিন কেটে গেছে সে সব দিনগুলো আজকাল একেবারে স্বপ্নের মত মনে ভেসে আসে আবার স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যায়। স্মৃতির ওপর কিন্তু তাদের দাগ থেকে যায়, তাই স্মৃতির পাতা থেকে এক একটা কাহিনী তোমাদের উপহার দিই। কি অদ্ভুত আমাদের এই চলে যাওয়া দিনগুলো !

যমালয়ের টিকিট

মনোরঞ্জন ঘোষ

পারিজাতের কাকা হরেনবাবু সকালেই সমরের কাছে ছুটে এলেন। দেখে ভদ্রলোককে বেশ বিচলিত বলেই মনে হলো।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি বললেন, 'সমরবাবু, পারিজাতের মুখে নিশ্চয়ই আপনি চিঠির কথা শুনেছেন। আপনার সঙ্গে আগে আলাপ না থাকলেও—'

—'তাতে কোনো ক্ষতি নেই।' মৃদু হেসে সমর বললো। 'আপনি যখন পারিজাতের কাকা, তখন অসঙ্কোচেই আমার কাছে আসতে পারেন। কিন্তু আপনি আগে স্থির হ'য়ে বসুন। আমি একটু চা করতে বলি। চা খেতে খেতে সব শুনবো।'

চেয়ারে গা এলিয়ে হরেনবাবু বললেন, 'আপনি আমায় স্থির হতে বলছেন। কিন্তু তা কি সম্ভব? এক জল্লাদের খাঁড়া আমার মাথার ওপর ঝুলছে। যে কোনো মুহূর্তে যার মৃত্যু হতে পারে, সে কি স্থির থাকতে পারে?'

হরেনবাবুকে আশ্বাস দিয়ে সমর বললো, 'অতো ঘাবড়াবার কিছু নেই। এটা কলকাতা শহর, মগের মুল্লুক নয়। বিশে-ডাকাত, রঘু-ডাকাতদেরও দিন শেষ হয়ে গেছে। উড়ো-চিঠি লিখে কারুকে খুন করবো বললেই খুন করা সহজ নয়। থানা-পুলিস কী করতে রয়েছে? তাছাড়া ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি-কমিশনার আমার বন্ধু। প্রয়োজন হলে তাঁর সাহায্য নেওয়া যাবে।'

'সেই জন্যেই আপনার কাছে এলাম। আমাকে বাঁচাবার যাহোক ব্যবস্থা আপনি একটা করতে পারবেন। ডিটেকটিভ গল্প লেখায় আপনার এতো সুনাম। কতো রহস্যের সমাধান আপনি করেছেন। পুলিস পর্যন্ত অনেক শক্ত মামলায় আপনার পরামর্শ নেয়, এ-কথাও আমি শুনেছি। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই আপনার অন্ধ ভক্ত!'

প্রশংসা চাপা দেবার জন্য চায়ের ফরমাশ করতে গেলো সমর।

অবশ্য হরেনবাবু যে-কথাগুলি বললেন তা খুবই সত্য। সমর গোয়েন্দা না হয়েও গোয়েন্দার বাড়া। সারা বাংলাদেশে গোয়েন্দা-কাহিনী লেখায় তার জুড়ি নেই। তার উপর সে সর্বদা লেখক-সুলভ নিছক মনগড়া কাহিনী বানিয়ে পাঠকদের কাছে কৌশলে অপরাধীকে আড়াল করে বোকা বানাবার চেষ্টা করে না। অনেক সময় সে সত্য যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংবাদ-পত্র বা পুলিস-দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত অপরাধীর সন্ধানে স্বেচ্ছায় পুলিসকে সাহায্য করে। ডিটেকটিভ গল্পের প্রতি আবালবৃদ্ধবনিতার আগ্রহ থাকার ফলে সমর পাড়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। তার বিনয় নম্র আচরণ ও মিষ্টি ব্যবহারের জন্য পাড়ার যাবতীয় সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানে তার জন্য এক সম্মানের আসন নির্দিষ্ট আছে। তাই সে পল্লীর দুর্গোৎসব কমিটির কোষাধ্যক্ষ, ইয়ংমেনস্ ফুটবল টিমের প্রেসিডেণ্ট, ড্রামাটিক ক্লাবের সেক্রেটারি…ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরেনবাবু এ-পাড়ায় নবাগত। পাড়ার দক্ষিণদিকের খালি প্লটটা চড়া দামে কিনে এক সুন্দর বড়ো বাড়ি করে গত বছর গৃহ-প্রবেশ করেছেন। তাঁর বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় পয়সার অভাব নেই।

হরেনবাবুর ভাইপো পারিজাতের সঙ্গে সমরের পরিচয় হয়েছিলো হঠাৎ। পুজোর ছুটিতে পাড়ার ছেলেরা 'কেদার রায়' নাটক অভিনয়ের তোড়জোড় করে, সমরের উপর তারা পরিচালনার ভার দেয়। কিন্তু মুশকিল হয়, রাজা কেদার রায়ের কিশোর পুত্রের ভূমিকার জন্য মনোমতো কাউকে না-পাওয়ায়। সকলেই যখন চিন্তিত, তখন একজন খবর দিলো সে এই পাড়ার বুকস্টলে একটি ছেলেকে হরেনবাবুর চাকর মধুর সঙ্গে এসে কিছু পুজো সংখ্যা কিশোর-পত্রিকা কিনতে দেখেছে। ছেলেটিকে সুন্দর দেখতে, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। রাজপুত্রের ভূমিকায় চমৎকার মানাবে। খবর নিয়ে জানা গেছে, ছেলেটি হরেনবাবুর ভাইপো। দার্জিলিঙে মিশনারিদের স্কুলে পড়াশোনা করে এবং সেখানে হোস্টেলে থাকে। পুজোর ছুটিতে তার একমাত্র অভিভাবক কাকার কাছে এসেছে।

ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যরা সেইদিনই হরেনবাবুর পাশের বাড়ির বাসিন্দা পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম শৈলেনবাবুর মারফতে হরেনবাবুর কাছ থেকে তাঁর ভাইপোর অভিনয় করার অনুমতি আদায় করে নেয়।

অভিনয়ের মহলার সময় সমরের সঙ্গে পারিজাতের পরিচয় হয়েছিলো।

পারিজাতকে সমরের ভালো লেগেছিলো, বেশ বুদ্ধিমান সপ্রতিভ ছেলেটি। কথায় কথায় সমর জেনেছিলো, পারিজাতের বাবা ছিলেন আসাম অঞ্চলের এক চা-বাগানের মালিক। তাঁর ছিলো শিকারের নেশা। বছর-তিনেক আগে শিকার করতে গিয়ে এক নরখাদক বাঘের কবলে পড়ে তিনি মারা যান। পারিজাত মাকে শৈশবেই হারিয়েছে। নাবালক পারিজাতের ভার নিয়েছেন তার বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, হরেনবাবু পারিজাতের বাবার ব্যবসা ও বিষয়-সম্পত্তি তিনিই দেখাশোনা করছেন। হরেনবাবু বিয়ে করেননি। ভাইপোকে তিনি ছেলের মতনই ভালোবাসেন।

বড়োদিনের সময় পারিজাত কলিকাতায় এলে সমরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে যায়। একদিন সকালে পারিজাত যখন সমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন সমর সেদিনের ডাকে-আসা কয়েকটি বিদেশী পত্র-পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। পারিজাত অবাক হয়ে বললো, 'সমরদা, আপনি দেখছি অনেক বিলিতি ম্যাগাজিনের গ্রাহক।'

সমর হেসে বললো, 'হ্যাঁ, ভাই। আজকালকার দিনে খুব পড়াশোনা না করলে লেখক হওয়া যায় না! অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকরা কী চিন্তা করছেন, কী ধরনের লিখছেন, তা জানা দরকার।'

কয়েকটা খামের ডাক-টিকিট লক্ষ্য করে পারিজাত জিগ্যেস করলো, 'নানা দেশে আপনার পেন-ফ্রেণ্ডস আছে বুঝি?'

—'তা, পেন-ফ্রেণ্ডস এদের বলা যেতে পারে। বর্তমানে বহু বাঙালী পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে আছেন—বিভিন্ন কাগজে আমার লেখা বা প্রকাশিত বই পড়ে মাঝে-মাঝে তাঁদের অনেকে চিঠি লেখেন, মতামত জানিয়ে।'

পারিজাত সাগ্রহে বললো, 'তাহলে আমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে খুব লাভ হয়েছে দেখছি।'

—'কেন বলো তো?'

—'ডাক-টিকিট জমানো আমার হবি। এবার আপনার কাছ থেকে নানা দেশের টিকিট আমি সংগ্রহ করতে পারবো। টিকিটগুলো দিতে আপনার আপত্তি আছে?'

সমর হেসে বললো, 'বিন্দুমাত্র নয়।'

পারিজাত খুব খুশী হয়ে খাম ও ম্যাগাজিনের কভারগুলি নিয়ে চলে গেলো।

তারপর থেকে রোজ ডাক আসার সময় পারিজাত একবার করে সমরের কাছে আসে নতুন টিকিটের সন্ধানে। সমর পরিহাস করে বলে, 'নতুন দেশের টিকিট কি আর আমার কাছে রোজ রোজ পাবে? মঙ্গল বা শুক্র গ্রহের সঙ্গে যেদিন পৃথিবীর চিঠিপত্রের লেনদেন হবে, সেদিন সেখানে আমার কোনো অনুরাগী পাঠক থাকলে হয়তো তোমায় নতুন টিকিট দিতে পারবো।'

পারিজাত সগর্বে জানালো, 'পরশু আমি কিছু দামী-দুষ্প্রাপ্য টিকিট পাবো।'

—'তাই নাকি? কার কাছ থেকে?'

—'পরশু আমার জন্মদিন। কাকা বলেছেন, সেদিন নিউ মার্কেটের দোকান থেকে কয়েকটা টিকিট কিনে এনে আমায় উপহার দেবেন।'

—'খুব আনন্দের কথা!'

সেই দিনই সন্ধ্যার পর সমর যখন এক ছোটো গল্পের প্লট নিয়ে ব্যস্ত, তখন পারিজাত আবার এলো।

অসময়ে তাকে দেখে সমর একটু অবাক হয়ে হেসে বললো, 'কী ব্যাপার? রাতে তো পিওন চিঠি দিয়ে যায় না।'

—'স্ট্যাম্পের সন্ধানে আসিনি। কাকা এক ভয়ানক চিঠি পেয়েছেন, তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

—'তোমার কথার মধ্যে দেখছি রহস্যের গন্ধ রয়েছে। তোমার কাকা কী এমন চিঠি পেলেন, যার জন্যে ভর-সন্ধ্যেবেলাতেই লেখাপড়া ছেড়ে তোমাকে হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে হলো?'

—'কাকাকে একজন খুন করবে বলে শাসিয়ে চিঠি দিয়েছে।'

সমর সাগ্রহে বললো, 'তাই নাকি? চিঠিটা কি তুমি সঙ্গে এনেছো?'

—'হ্যাঁ। এই যে।' পারিজাত পকেট থেকে একটা চিঠি বার করলো।

সমর মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা দেখলো। ছোটো ছেলের লেখার মতন আঁকা-বাঁকা অক্ষর। স্পষ্ট বোঝা গেলো, লেখক হস্তাক্ষর গোপন রাখতে চায়। তার মানে, সে পত্র-প্রাপকের অপরিচিত নয়। চিঠিটা

খুবই ছোটো, মাত্র তিনটি বাক্য। তার মধ্যে একটি আবার প্রবাদবাক্য—'কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ! কারও জন্মদিন, কারও মৃত্যুদিন। পরশুর জন্য প্রস্তুত হও!'

চিঠিটা উল্টে-পাল্টে দেখে সমর জিগ্যেস করলো, 'পরশু তোমার জন্মদিন?'

—'হ্যাঁ, সেইজন্যে কাকা ভাবছেন যে, খুনী বলতে চেয়েছে সেদিন আমার জন্মদিন আর তাঁর মৃত্যুদিন।'

—'তোমার জন্মদিন উপলক্ষে কোনো পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে নাকি?'

—'আমার ইচ্ছে ছিলো পাড়ার নতুন বন্ধুদের—মানে, যাদের সঙ্গে থিয়েটার করেছিলাম—তাদের সকলকে বলবো। কিন্তু আজ বিকেলে কাকা অফিস থেকে ফিরতেই তাঁর সঙ্গে যখন এই নিয়ে কথা বলতে গেলাম তখন তিনি এই চিঠিটা দেখালেন। তিনি এতই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যে, পার্টি উপলক্ষে কাউকে আর নিমন্ত্রণ করা চলবে না।'

সমর হেসে বললো, 'ভালোই হয়েছে। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে খুনোখুনী মোটেই ভালো দৃশ্য নয়। রক্ত দেখলেই অনেকের গা ঘুলিয়ে যাবে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন, সমরদা! কাকা কী রকম বিচলিত হয়েছেন তা বুঝতে পারছেন না। আমার সঙ্গে তিনি এখুনি আপনার কাছে ছুটে আসতে চাচ্ছিলেন। আমি বললাম, আগে ব্যাপারটা আপনাকে জানাই, তারপর আপনার কথামতো ব্যবস্থা করা যাবে। এখন কী করা যায় বলুন তো?'

—'বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোও।' সমর হেসে বলল।

—'সে কী?'

—'হ্যাঁ। আর তোমার কাকাকে কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। খুনী পরশুর জন্যে প্রস্তুত হতে বলেছে। কাজেই কালকের দিনটা আমাদের হাতে আছে; তার মধ্যে আমার এই গল্পটা শেষ করতে দাও, নইলে সম্পাদকমশাইয়ের কাছে কথার খেলাপে মিথ্যেবাদী হয়ে যাবো।'

পারিজাত খুব ক্ষুণ্ণ মনেই সমরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। এমন একটা বাস্তব খুনের সম্ভাবনার ওপর কোনো গুরুত্ব না-দিয়ে কল্প-জগতের

খুনের কল্পনায় সমরদা ব্যস্ত থাকবে, এতোখানি হৃদয়হীনতা সে বেচারা আশা করেনি।

চায়ে চুমুক দিয়ে সমর বললে, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, হরেনবাবু। সেগুলোর যথাযথ উত্তরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

চায়ের কাপ নামিয়ে হরেনবাবু বললেন, 'বলুন, কী আপনার জিজ্ঞাস্য।'

—'যে-কোনো খুনের পেছনে একটা মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। আপনাকে খুন করার পেছনে কার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

—'তা তো বলতে পারি না। আমাকে খুন করায় কার লাভ তা আমার জানা নেই।'

—'কারও সঙ্গে আপনার কোনো শত্রুতা নেই?'

—'একজন অবশ্য শত্রু বলে আমায় মনে করতে পারে, কারণ সম্প্রতি তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি। সে পয়সার হিসেবে গোলমাল করেছিলো। চাকরি যাওয়ার প্রতিহিংসার বশে সে হয়তো আমায় খুন করতে চায়।'

—'আচ্ছা, আপনি তো ধনী ব্যক্তি। আপনার মৃত্যুর পর আপনার বিষয়-সম্পত্তি কে পাবে তার কোনো উইল করেছেন?'

হরেনবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বলেন, 'না, কোনো উইল করিনি তবে একটা কথা—আমি মোটেই ধনী নই। বিষয়-সম্পত্তি আমার কিছু নেই; আমি কেবল আছি মাত্র।'

সমর একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলো, 'তাহলে আপনার এই বাড়ি-গাড়ি—এ সব কার?'

—'এ-সবের ভাবী মালিক পারিজাত। পারিজাত নাবালক বলে আমি পারিজাতের বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসার তদ্বির-তদারক করি। পারিজাতের বাবার উইল অনুযায়ী আমি তার অভিভাবক হয়েছি। ও যখন সাবালক হবে তখন তার পৈতৃক সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

সমর আরো অবাক হয়ে বললো, 'সাধারণত অর্থই অনর্থের মূল হয়। অর্থের জন্যেও তো আপনাকে খুন করে লাভ নেই বুঝছি। চিঠিটা তাহলে তো খুবই রহস্যময়। ওটা কি আপনি ডাকে পেয়েছেন?'

—'হ্যাঁ সকালের ডাকে বাড়িতে এসেছিলো।'

—'হুঁ!' সমর একটু চিন্তিত হলো। তারপর প্রশ্ন করলো, 'আপনার বাড়িতে লোকজন কে কে আছে?'

—'আমি বিয়ে-থা করিনি। অন্য আত্মীয়-স্বজন কেউ এ-বাড়িতে থাকে না। রান্নার জন্যে এক উড়ে ঠাকুর, বাসন মাজার ঠিকে ঝি, এক চাকর, ড্রাইভার, আর বহুদিনের বিশ্বাসী মধু।'

—'মধু কতোদিন আছে?'

—'মধু আছে ছেলেবেলা থেকেই, বীরেনদা—মানে, পারিজাতের বাবার কাছে কাজ করেছে। মা-হারা পারিজাতকে মানুষ করেছে সে-ই। দাদা তাই ব্যবস্থা করে গেছে, যতোদিন সে জীবিত থাকবে ততোদিন এখানেই কাজ করবে।'

সমর আর কোনো প্রশ্ন করলো না। নিজের মনে কী যেন ভাবতে থাকলো।

বিচলিত হরেনবাবু এবার তাকে প্রশ্ন করলেন, 'পরশু আত্মরক্ষার কী ব্যবস্থা করা যায়? আপনি কী পরামর্শ দেন? ভাবছি ঠাকুর চাকর ড্রাইভারকে সেদিন ছুটি দিয়ে দেবো। কে জানে, ওরা খুনীরই কোনো অনুচর কি-না! পরশু রাতে বাড়িতে শুধু আমি, পারিজাত ও মধু থাকবো। আরো ভরসা পাই, আপনি যদি দয়া করে সেই রাতটুকু আমার বাড়িতে কাটান।'

—'বেশ তো। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনাকে আমি সম্পূর্ণ ভরসা দিচ্ছি, আপনার খুন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

—'তাহলে এই চিঠিটাকে আপনি বাজে বলতে চান?'

—'না। চিঠিটা গুরুতর ও রহস্যপূর্ণ। যা হোক, পরশু রাতে এই রহস্যের সমাধান করবো। আপনি শুধু মধুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে দেখতে চাই।'

—'বেশ তো। আমি বাড়ি গিয়েই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' তিনি উঠে পড়লেন।

সমর আবার তাঁকে আশ্বাস দিলো, পারিজাতের জন্মদিনটা আপনার মৃত্যুদিন কিছুতেই হবে না। রহস্য আমি ইতিমধ্যেই অনেকটা ভেদ করে ফেলেছি। পরশু যদি খুনী হত্যার চেষ্টা করে, তাহলে হাতে-নাতে

ধরতে পারবো। আপনার অনুরোধ মতো সেদিন সারাক্ষণ আপনার পাশে আমি থাকবো।'

সমর চিঠির রহস্যভেদ করে ফেলেছে শুনে হরেনবাবু বেশ বিস্মিত হন।

মধু আসতে সমর তাকে সরাসরি কোনো প্রশ্ন করলো না, বরং তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলো।

মধু সমরকে অনেক পারিবারিক ইতিহাস শোনালো। ছেলেবেলায় অনাথ মধুকে পারিজাতের বাবা বীরেনবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন। কাজ-কর্মের গুণে মধু তাঁর খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলো। যখনই তিনি শিকার করতে যেতেন, মধু সঙ্গে থাকতো। পারিজাত মধুর হাতেই মানুষ। পারিজাত যাতে বড়ো হয়ে বিলেত গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, সে ব্যবস্থাও বীরেনবাবু করে গেছেন। সামনের বছর পারিজাত সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে বিলেতে যাবে। সেখানে বীরেনবাবুর পুরোনো বন্ধু এক সাহেব শিকারী ও চা-বাগানের মালিক পারিজাতের দেখাশোনা করবেন। তারপর বিলেত থেকে ফিরে সাবালক পারিজাত সব সম্পত্তির মালিক হয়ে বসবে।

সব শুনে শেষে সমর বললে, 'তুমি বীরেনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে? বন্দুক টন্দুক ছুঁড়তে কখনো?'

—'কী যে বলেন, বাবু! কর্তার সব বন্দুক রাইফেল তো আমার হেপাজতে থাকতো। বন্দুক ছুঁড়তে পারতাম, টিপও ভালো ছিলো, তাই তো কর্তা সঙ্গে নিতেন।'

—'ভালোই হলো। তোমার সেই টিপ পরশু আবার কাজে লাগতে পারে। খুনীর চিঠির কথা তুমি নিশ্চয় শুনেছো? আমার একটা রিভলবার আছে, সেটা রাত্রে তোমার কাছে লুকিয়ে রেখে দেবে। কাউকে বলবে না,—হরেনবাবু বা পারিজাতকেও নয়। আমি হরেনবাবুকে পাহারা দেবো, আর তুমি পারিজাতকে।'

মধু চিন্তিতভাবে বললো, 'দাদাবাবুরও কি খুন হবার ভয় আছে?'

—'হ্যাঁ,—খুব বেশি ভয়। তুমি দাদাবাবুকে মানুষ করেছো বলে এ কথা তোমায় বিশ্বাস করে বললাম। সেদিন রাত্রে তুমি দাদাবাবুর ঘরে শোবে। দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করবে। রাত্রে কোনো লোককে ঘরে ঢুকতে দেবে না। এমন কি, আমাকে বা হরেন বাবুকেও নয়।'

—'বুঝেছি। খুনী আপনাদের বেশ ধরে আসতে পারে। কিন্তু বাবু, আমি শুনেছি, চিঠিতে কাকাবাবুকে খুন করার কথা আছে, দাদাবাবুকে নয়।'

—'চিঠি কে লিখেছে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি শুধু আমার কথামতো কাজ করো, তাহলে কোনো বিপদ হবে না।'

—'ঠিক আছে, বাবু।'

জন্মদিনের সকালেই এক কাণ্ড ঘটলো।

হরেনবাবু নিজের ঘরে চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ জানলার বাইরে থেকে কে যেন তাঁকে লক্ষ্য করে একটা ছোরা ছুঁড়ে মারে। সৌভাগ্যক্রমে সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হরেনবাবুর কান ঘেঁসে গিয়ে চেয়ারের পিছনে ঠেসান দেবার কাঠে গেঁথে যায়।

হরেনবাবুর চীৎকারে সবাই ছুটে এলো। হরেনবাবু পারিজাতকে বললেন, 'শীগ্‌গির সমরবাবুকে ডেকে আন। খুনী সাত-সকালেই আক্রমণ শুরু করেছে।'

সমর এসে চেয়ারে গাঁথা ছোরাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করলো। চেয়ারের কাঠে ছোরার ফলার প্রায় আধখানা ঢুকে গেছে। সে প্রশ্ন করলো, 'আক্রমণকারীকে দেখতে পেয়েছিলেন?'

—'না। কাগজটা মুখের কাছে তুলে পড়ছিলাম, তাই কাউকে দেখতে পাইনি।'

সমর গম্ভীরভাবে বললো, 'হুঁ। খুনী প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছে বলে নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবে। ভয় নেই। আমি তখন তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলবো।'

হরেনবাবু ভয়ে সেদিন আর কাজকর্মে বেরুলেন না। বিকেলে একবার নিজেই গাড়ি চালিয়ে মার্কেটে গেলেন, পারিজাতের জন্য ডাক-টিকিট কিনতে।

সমর সারাদিন হরেনবাবুর বাড়ি পারিজাতের সঙ্গে ক্যারাম খেলে কাটালো। বিকেলে হরেনবাবু যখন বার হন, তখন ওরা দুজনে বাগানেই ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যায় পারিজাতের জন্মলগ্নে তাকে উপহার দেয়া হয়। হরেনবাবু দিলেন কিছু স্ট্যাম্প ও একটা দামী অ্যালবাম, সমর দিলো একটি বই—গোয়েন্দা-গল্পের সঞ্চয়ন।

তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে সবাই শোবার উদ্যোগ করে। হরেনবাবুর পাশের ঘর সমরের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, দুই ঘরের মাঝের যাতায়াতের দরজা সারারাত খোলা থাকবে, ঠিক হয়।

সমর হরেনবাবুকে নিজের রিভলবার দেখিয়ে বললো, 'কোনো ভয় নেই। আমার কাছে অস্ত্র আছে। তাছাড়া আমি আজ ঘুমোবো না, টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে সারারাত পড়বো-লিখবো।'

হরেনবাবু রিভলবার দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার রিভলবার আছে জানতাম না তো!'

সমর হেসে বললো, 'কাল্পনিক মামলার চেয়ে অনেক সময় সত্যি মামলায় জড়িত থাকি বলে আমার ডেপুটি-কমিশনার বন্ধু এটার লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। আমি পারিজাতের ঘরটা একবার পরীক্ষা করে আসি।'

পারিজাতের ঘরে গিয়ে সমর দেখলো, সে স্ট্যাম্প ও অ্যালবাম ইত্যাদি নিয়ে বসেছে। মধু তার কাছে বসে আছে।

সমরকে দেখে পারিজাত বললো, 'কী মুশকিলে পড়েছি জানেন, সমরদা? স্ট্যাম্পগুলো অ্যালবামে সাঁটতে পারছি না। আজ সকালেই গঁদের শিশিটা কাকার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে। বিকেলে একটা কিনে আনবেন বলেছিলেন, কিন্তু ভুলে গেছেন। মধুকে বলেছি খানিকটা আঠার ব্যবস্থা করতে।'

সমর বললো, 'কাল সকালেই স্ট্যাম্প সাজিও, এখন শুয়ে পড়ো। মধু, একবার এদিকে শোনো তো।' মধুকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে চুপি-চুপি তার হাতে রিভলবার গুঁজে দিয়ে সমর বললো, 'যা বলেছি, মনে আছে?'

—'হ্যাঁ বাবু।'

সমর নিজের ঘরে এসে একটা বই খুলে বসতে-না-বসতেই পারিজাতের চীৎকার কানে এলো, 'কাকাবাবু, সমরদা—শীগ্‌গির আসুন—মধু কেমন করছে!'

সমর ও হরেনবাবু ছুটে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পারিজাতের ঘরে পা দিয়ে তারা দেখলেন, মধু আড়ষ্ট হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। পারিজাত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে।

সমর জিগ্যেস করলো, 'কী হয়েছিলো ?'

পারিজাত জবাব দিলো, 'আপনার বইটা নিয়ে আমি বিছানায় শুয়েছি। মধু টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে অ্যালবামে স্ট্যাম্প সাঁটছিলো। হঠাৎ দেখি সে ছটফট করতে করতে দড়াম করে পড়ে গেলো।'

হরেনবাবু সমরকে জিগ্যেস করলেন, 'মৃগীরোগের আক্রমণে মৃত্যু নাকি ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি ডাক্তারকে ফোন করুন। সেই সঙ্গে থানাতেও। অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন।'

হরেনবাবু ফোন করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সমর টেবিলের অ্যালবাম ও স্ট্যাম্প পরীক্ষা করে দেখলো। লক্ষ্য করলো, স্ট্যাম্পগুলোর পিছনে সাদা পাউডারের মতো গুঁড়ো মাখানো।

হরেনবাবু ফিরে আসতে তাঁকে বললো, 'ডাক্তার, পুলিস না-আসা পর্যন্ত আপনি মৃতদেহের কাছে থাকুন। আমি পারিজাতকে নিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছি। বেচারা চোখের সামনে এই রকম মৃত্যু দেখে ঘাবড়ে গেছে।'

ঘরের বাইরে এসেই পারিজাতকে সমর জিগ্যেস করলো, 'টেলিফোনটা কোন ঘরে আছে ?'

সমর তার বন্ধু ডিটেকটিভ-ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি-কমিশনারকে ফোন করলো, 'হ্যালো ! ভুজঙ্গ ?···আমি সমর···একটা খুন হয়েছে···আমাদের পাড়ায় কে খুন করেছে আমি জানি···আমি সেখানেই আছি···তুমি ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসো···খুনীর নাম ও খুনের প্রমাণ আমি তোমায় বলবো।'

টেলিফোন রেখে পারিজাতকে সমর বললো, 'মধু প্রাণ দিয়ে তোমায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেলো। নইলে মরার কথা ছিলো তোমার।'

পারিজাত অবাক হয়ে বললো, 'আপনার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না।'

—'এখন মুখ বুজে থাকো, এখুনি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

পুলিস ইনস্‌পেক্টর ও ডাক্তার এলেন। তাঁরা যখন মৃতদেহ পরীক্ষা করছেন এমন সময় ভুজঙ্গবাবু উপস্থিত হলেন। ইনস্‌পেক্টর শশব্যস্ত হয়ে এসে বললো, 'আপনি স্যর ?'

—'মার্ডার কেস্ বলে আমি রিপোর্ট পেয়েছি।'

হরেনবাবু অবাক হয়ে বললো, 'মার্ডার ! কিন্তু দেহে তো কোনো

আঘাতের চিহ্ন নেই। তাছাড়া আমার ভাইপো মৃত্যুর সময় এর কাছে ছিলো, সে তো বলছে হঠাৎ মারা গেছে। হার্ট ফেল করে বা মৃগী রোগে—'

সমর বাধা দিয়ে বললো, 'না মার্ডারই। তবে আঘাতে মৃত্যু নয়, বিষক্রিয়ায়। পটাসিয়াম সায়নাইড দিয়ে মারা হয়েছে।'

হরেনবাবু আরো অবাক হয়ে বললেন, 'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধরা পড়বে। তবে হত্যাকারী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। রামের বদলে শ্যাম মারা গেলো।'

হরেনবাবু বললেন, 'তার মানে আমার বদলে মধু?'

—'না, পারিজাতের বদলে মধু। আর হত্যাকারী হচ্ছেন আপনি। ভুজঙ্গ, গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় হরেনবাবুর নামটা বসিয়ে নাও। আমি যুক্তিগুলো দিচ্ছি, কোর্টে প্রমাণ করার ভার তোমাদের।'

হরেনবাবু সমরকে বললেন, 'গাঁজাখুরি গোয়েন্দাকাহিনী লিখে লিখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মৃত্যুর সময় আমি আপনার পাশের ঘরে ছিলাম। আমি কি করে ওকে বিষ খাওয়াবো?'

সমর বললো, 'আপনি পারিজাতকে উপহার দেয়া টিকিটের পেছনে পটাসিয়াম সায়নাইডের গুঁড়ো মাখিয়ে দিয়েছিলেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় পুলিস সহজেই এটা প্রমাণ করতে পারবে। গঁদের শিশি আপনি ইচ্ছে করে ভেঙেছিলেন এবং ইচ্ছে করেই নতুন শিশি কিনে আনেননি। আপনি জানতেন, স্ট্যাম্পগুলো অ্যালবামে সাঁটার জন্যে পারিজাতের দেরি সইবে না। গঁদের অভাবে থুথু দিয়ে সাঁটাতে যাবে এবং তার ফলেই মরবে। কিন্তু দুটো কারণে ও বেঁচে গেছে—প্রথম থুথু দিয়ে কিছু আটকানোর নোংরা অভ্যেস ওর নেই, দ্বিতীয় গোয়েন্দা গল্পের বই স্ট্যাম্পের চেয়ে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো বেশী, তাই স্ট্যাম্প সাঁটার ভার ও মধুর ওপর দেয়। উড়ো চিঠিটা আপনারই লেখা। আপনি বলেছেন, চিঠিটা সকালে বাড়িতে এসেছিলো। কিন্তু আমি এক সময় মধুকে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম, সেদিন ডাকে আপনার নামে কোনো চিঠি আসেনি। তাছাড়া আপনার কথা মতো চিঠিটা সকালের ডাকে এলে আপনি যে পরিমাণ বিচলিত হয়েছিলেন, তাতে বিকেল পর্যন্ত এটার কথা পারিজাতকে না বলা অস্বাভাবিক। আমি

তখনই বুঝেছিলাম, বিচলিত হওয়ার ভাবটা আপনার ভান। আপনার হস্তাক্ষর পারিজাতের কাছে গোপন করার জন্য বাঁ হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে ওটা লিখেছিলেন।

—'আপনি বলেছিলেন অফিসের একজন হিসেবের গোলমাল করায় তাকে তাড়িয়েছেন। সে প্রতিহিংসার বশে খুন করতে চাইছে। কিন্তু মধুর মুখ থেকে আমি জেনেছিলাম, সেই কর্মচারীটি বীরেনবাবুর আমলের লোক, খুব বিশ্বাসী। আমার মনে হয়েছিলো, ব্যবসার টাকাকড়ির গোলমাল হয়তো আপনি করেছেন, পাছে সে ধরে ফ্যালে সেই ভেবে তাকে আপনি সরিয়েছেন।'

—'সকালে আপনাকে ছোরা ছুঁড়ে হত্যার যে চেষ্টা হয়েছিলো, সেটাও আপনারই সাজানো ঘটনা। মুখের সামনে খবরের-কাগজ তুলে দু-হাত দিয়ে ধরে পড়লে ছোরা কিছুতেই আপনার কান ঘেঁসে যেতে পারে না, কাগজকে বিদ্ধ না-করে। তাছাড়া ছোরার আধখানা চেয়ারের কাঠে ঢুকে গিয়েছিলো। আপনার জানলা থেকে চেয়ারের দূরত্ব প্রায় পনেরো ফুট। আততায়ী যদি বাগানের মধ্যে থেকে অর্থাৎ জানলা থেকে আরও ফুট-পাঁচেক দূর, অর্থাৎ মোট বিশ ফুট দূর থেকে ছোরাটা ছুঁড়ে থাকে, তাহলে অমানুষিক শক্তির অধিকারী না-হলে চেয়ারের শক্ত কাঠে ছোরার অত-খানি গাঁথা সম্ভব নয়। আরো কাছ থেকে, মানে ঘরের মধ্য থেকেই ছোরাটা চেয়ারে গাঁথা হয়েছিলো। ঘরে তখন আপনি ছাড়া কেউ ছিলো না।

তাছাড়া বিকেলে বাগানে বেড়াবার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম, আপনার জানলার কাছের ফুলগাছগুলোর কোনটাই আততায়ীর পায়ের ভারে পিষ্ট হয়নি। আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যে, আততায়ীর আক্রমণ অলীক।'

ভুজঙ্গবাবু প্রশ্ন করলেন, 'হত্যা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কী, সমর?'

সমর বললো, 'অর্থ-লালসা। পারিজাতের মৃত্যু হলে হরেনবাবু নিশ্চিন্তে সব ভোগ-দখল করতে পারবেন। পারিজাত সামনের বছর পড়াশোনা করতে বিলেত যেতে পারে। দেশে যখন ফিরবে তখন সে সাবালক। হরেনবাবুর নাগালের বাইরে চলে যাবার আগেই তাকে মারা দরকার।'

—'কিন্তু হরেনবাবুর উদ্দেশ্য তুমি ধরলে কী করে?'

সমর হেসে বললো, 'কথায় বলে—অতি চালাকের গলায় দড়ি। হরেনবাবু সহজেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু একটু বেশী চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। পারিজাতের মুখে তিনি আমার কথা শুনে বুঝেছিলাম, পারিজাতের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে আমি হয়তো অনুসন্ধান করবো। তাই আমার কাছে ভান করলেন যেন অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি খুনের চেষ্টায় আছে এবং তার লক্ষ্য পারিজাত নয়, হরেনবাবুই। পারিজাতের মৃত্যু ঘটলে আমি ভাববো, খুনী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তাছাড়া উনি আর একটু বেশি চালাকি করে আমাকেও খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন। পারিজাত আমার কাছ থেকে ডাক-টিকিট নিতো এটা উনি জানতেন। পারিজাত মারা গেলে পুলিশ যদি ডাক-টিকিটে বিষ পেতো, তাহলে আমাকে জড়াতে চাইতো খুনের সঙ্গে। কোন্ টিকিট আমি পারিজাতকে দিয়েছি, আর কোন্টা উনি দিয়েছেন তা পারিজাত ছাড়া আর কেউ জানে না। পারিজাতের অবর্তমানে ওঁর দেয়া টিকিটের কথা উনি অস্বীকার করতেন।'

ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'সাজ্যাতিক লোক তো! তোমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার চেষ্টায় ছিলেন! এখন উনি যাতে ঝোলেন সে চেষ্টা আমরা করবো।'

সমর পারিজাতকে বললো, 'তুমি নতুন দেশের টিকিট খোঁজো, তাই তোমার কাকা জন্মদিনে তোমাকে যমালয়ের টিকিট উপহার দিয়েছিলেন।'

আদি পর্ব

জয়ন্ত চৌধুরী

ভারতবিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মনীশ গুপ্তর নাম আজ কে না জানে? স্বয়ং পুলিশ কমিশনার সাহেব কোন জটিল কেসের কুলকিনারা করতে না পারলে মনীশ গুপ্তকে ডাকেন পরামর্শের জন্যে।

কিন্তু এই বিখ্যাত লোকটির সাফল্যের আদিপর্ব অর্থাৎ একেবারে

গোড়াকার ইতিহাসের সঙ্গে বোধহয় অনেকেই পরিচিত নয়। সেই গোড়াকার কথাই আজ বলব।

সে আজ কুড়ি বছরেরও আগেকার কথা। ইডেন্ গার্ডেনের ব্যাণ্ড্ স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা বেঞ্চে বসে এক আধাবয়সী ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানছিলেন এমন সময় একটি কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে তাঁর পাশে এসে বসল। শ্যামবর্ণ, চোখদুটো বেশ বড় বড় এবং জ্বলজ্বলে, লম্বাটে গড়ন। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি এবং সস্তাদরের খেলো একটা টুইল সার্ট।

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ একসময় বলে উঠল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার?'

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আমাকে বলছো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাকেই বলছি। বলছিলুম আপনার সন্ধানে কোন চাকরি-বাকরি খালি আছে? ভদ্দরলোকের ছেলে, বেকার বসে আছি; দয়া করে একটু যদি সুলুক-সন্ধান বলে দেন।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবলেন, তারপর হঠাৎ একসময় বলে উঠলেন, 'তুমি কি কাজ করতে চাও?'

'আজ্ঞে, যে কাজ দেবেন।'

একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'হাইকোর্টের জজিয়তি যদি দিই,—পারবে?'

ছেলেটি একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর দিলে, 'হাইকোর্টের জজিয়তি করবার মত বিদ্যেবুদ্ধি যদি থাকতো, তাহলে আপনার কাছে বোধহয় আসতুম না স্যার।'

ভদ্রলোক ছেলেটির দিকে একবার আড়-চোখে চেয়ে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'হুঁ।'—তারপর পূর্বের মতই সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একসময় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'দূরে ঐ ঝোপটার কাছে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে। ও লোকটি সম্বন্ধে তোমার মনে কি ধারণা হয়?'

ছেলেটি বলে উঠলো, 'তা কেমন করে বলব স্যার? তবে যদি কিছু

মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলতে পারি।'

'বেশ বল।'

'যে কোন কারণেই হোক, আপনি ও-লোকটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন।'

'কিসে বুঝলে?'

'এটা বোঝা আর শক্ত কি স্যার? আপনি লোকটার দিকে একবার চাইলেনও না, অথচ লোকটা যে ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার গায়ে যে আদ্দির পাঞ্জাবী রয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছেন। এ থেকে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, আপনি ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছেন, অথচ লোকটি যাতে সে কথা জানতে না পারে, তার জন্যও চেষ্টার কসুর নেই। এ থেকে এটা আবিষ্কার করা আদৌ শক্ত নয় যে, আপনি লোকটাকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। কেমন, ঠিক কি না বলুন স্যার?

ভদ্রলোক আবার চুপ করে গেলেন এবং পূর্বের মতই অন্যমনস্ক-ভাবে সিগারেট টানতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটাবার পর ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন, 'তুমি কাল সকাল ন'টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। কার্ডে ঠিকানাটা রইলো।'

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক হাইকোর্টের দিকে হন হন করে পা চালিয়ে দিলেন। ছেলেটি কার্ডটা হাতে নিলে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তার সেই ঝোপটার দিকে। সে যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। দেখলে, আদ্দির পাঞ্জাবী পরা ঝোপের ধারের সেই লোকটিও হাইকোর্টের দিকে চলতে শুরু করেছে।

ছেলেটি আপন মনেই বললে, 'ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না।' তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো, 'চুলোয় যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।'

কথাটা শেষ করেই সে কার্ডখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। পরক্ষণেই বড় বড় চোখ দুটো তার আরও বড় হয়ে উঠলো। কার্ডের ওপর লেখা ছিল, 'প্রভাত গাঙ্গুলী, প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ। —নং ক্রিক্ রো।'

কার্ডখানা পকেটে ফেলে সে আপন মনে বিড় বিড় করে বলে যেতে লাগলো, 'কি আশ্চর্য। বিখ্যাত ডিটেকৃটিভ, প্রভাত গাঙ্গুলীর সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করছিলুম।—অত বড় লোকের সঙ্গে কথা কইছি তা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম, তাহলে কি অমন করে যা-তা আবোল-তাবোল বকতুম ? ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোক, কি মনে করলেন ?

কিন্তু পরক্ষণেই একটা অভূতপূর্ব আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠলো। এই অদ্ভুতকর্মা লোকটির সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব কত কথাই না সে এতদিন শুনে এসেছে। আজ সেই লোকটি শুধু তার সঙ্গে আলাপ করেনি, তাকে বাড়িতে গিয়ে দেখা করবার জন্যে কার্ড দিয়ে গেছে। এর চেয়ে সৌভাগ্য তার পক্ষে আর কি হতে পারে ?

পরদিন বেলা ঠিক ন'টার সময় ছেলেটি প্রভাত গাঙ্গুলীর ক্রিক্ রো'র বাসায় গিয়ে হাজির। প্রভাতবাবু তাকে সুমুখের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারটার ওপর হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসে বললেন, 'তোমার নামটি তো এখনো পর্যন্ত শুনলুম না।'

'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীমনীশচন্দ্র গুপ্ত।'

'বেশ!—দেশ কোথায় ?'

'আজ্ঞে, বারাসতের কাছে।'

'হুঁ!—কলকাতায় চাকরির সন্ধানে এসেছ বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতদূর পর্যন্ত পড়েছ ?'

'আজ্ঞে, ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ফি যোগাড় করতে পারিনি বলে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে একটা লেটারপ্যাড তুলে নিয়ে কি লিখতে বসলেন।

লেখা শেষ হলে কাগজটা ভাঁজ করে একটা খামে পুরে মনীশের হাতে দিয়ে বললেন, 'খামের ওপর যে ঠিকানা দিলুম, সেই ঠিকানায় গিয়ে নবগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমাকে কাজ দেবেন।'

খামটা হাতে নিয়ে মনীশ জিজ্ঞেস করলে, 'আজ্ঞে, তাঁর ওখানে কি কাজ করতে হবে?'

'সেটা তিনিই তোমাকে বাত্‌লে দেবেন। আমি কেবল গোটা-কতক কথা তোমাকে বলতে চাই। মন দিয়ে শুনে যাও। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে যাঁর কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন একজন ভারত-বিখ্যাত লোক। লোকটি যেমন ধনী তেমনি পণ্ডিত। ভদ্রলোক বিবাহ করেননি। যে বাড়িতে তোমাকে পাঠাচ্ছি সে বাড়িতে তিনি একাই থাকেন, আর থাকে চাকর-বাকর এবং কয়েকজন কর্মচারী। বাড়িটাকে তিনি পুরোদস্তুর একটি মিউজিয়াম করে তুলেছেন। দোতলার একটা ঘরে তিনি নিজে থাকেন। পাশের ঘরে থাকে মিউজিয়ামের কয়েকজন কর্মচারী এবং তারও ওপাশের ঘরে থাকে চাকর-বাকরেরা। একতলাটা খালিই পড়ে থাকে। তেতলার ঘরগুলোতে থাকে তাঁর মহামূল্য দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহগুলো। কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সংগ্রহ যে তাঁর আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর কোন কোন সংগ্রহ খৃষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছরেরও আগেকার। এই সব সংগ্রহের পিছনে ভদ্রলোক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। সে যাক, এখন কাজের কথা বলি আজ কয়েকদিন হোলো ভদ্রলোকের সংগ্রহাগার থেকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস চুরি গেছে। জিনিসটা হচ্ছে অশোকের সময়কার একটি অটুট বুদ্ধমূর্তি। মূর্তিটা একটি আস্ত নীলা থেকে কুঁদে বার করা।

এই চুরির কিনারা করবার জন্যে ভদ্রলোক সম্প্রতি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। তোমাকে ওখানে পাঠাচ্ছি চাকরি করবার জন্যে বটে, কিন্তু সেইটেই তোমার আসল কাজ নয়। ওখানে তুমি যে কাজই কর-না কেন, জানবে—সেটা আসলে হচ্ছে লোক দেখান ব্যাপার। তোমার আসল কাজ হচ্ছে ও বাড়ির চাকর-বাকর এবং কর্মচারীদের ওপর নজর রাখা। কেমন করে নজর রাখবে বা বিশেষ করে কার কার ওপর নজর রাখবে সেটা এখান থেকে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; ওখানে থাকতে থাকতে তুমি নিজেই সেটা বুঝতে পারবে। প্রতিদিন রাত ন'টার পর আমার সঙ্গে দেখা করে ওখানকার খবরাখবর দেবে। আমার চিঠি নিয়ে আজই বিকেলের দিকে নবগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। বেশ করে চারিদিকে নজর রাখবে। কাউকে বিশ্বাস করবে না, তা সে যেই হোক

না কেন।'

বেলা পাঁচটা আন্দাজ মনীশ গিয়ে হাজির হলো নবগোপালবাবুর বাড়িতে। পেল্লায় তেতলা বাড়ি, বড় বড় জানলা-দরজা লম্বা লম্বা হল। ইয়া উঁচু উঁচু তলা। বসত-বাড়ি না বলে তাকে অফিস-বাড়ি বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।

একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে গদিমোড়া একটা দামী চেয়ারে বসেছিলেন নবগোপালবাবু। রোগা জরাজীর্ণ চেহারা, বার্ধক্যের সমস্ত লক্ষণই চেহারায় পরিস্ফুট। গায়ে একটা গলাবন্ধ লংক্লথের কোট। পায়ে একটা সাধারণ কট্‌কি চটি।

প্রভাত গাঙ্গুলীর চিঠিটা পড়া শেষ করে চশমার পুরু কাঁচ দুটোর ভিতর দিয়ে মনীশের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন—'ঐ চেয়ারটাতে বস। তোমার নামই মনীশ গুপ্ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, তোমাকে আমি আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিতে চাই। কি কাজ তোমাকে দিই বলত? বুঝতেই তো পারছ মিউজিয়ামের কাজটা হচ্ছে একটা অছিলা মাত্র। আসলে তোমাকে করতে হবে গোয়েন্দাগিরি। এখন আসল কথা হচ্ছে, তোমাকে কি কাজ দেওয়া যায়।' তারপর কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা হয়েছে, তুমি আজ থেকে হলে আমার পার্সনাল অ্যাসিস্টেণ্ট। আজ থেকেই তা'হলে কাজে লেগে যাও—কেমন? এখানকার অদ্ভুত চুরির সম্বন্ধে প্রভাতবাবুর কাছ থেকে সবই শুনেছ নিশ্চয়; সুতরাং সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার দরকার হবে না বোধ হয়।'

মনীশ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই শুনেছি। কেবল একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'বল, কি জানতে চাও?'

'বলছিলুম, আপনি কি আপনার কর্মচারীদের কাউকে সন্দেহ করেন?'

'না না আদৌ নয়, আদৌ নয়। আমার বিশ্বাস কোন দর্শকই এই কাজ করেছে। প্রতিদিন বহু লোকই তো মিউজিয়াম দেখতে আসে। তাদেরই কেউ সম্ভবত মূর্তিটা সরিয়েছে। ছোট্ট একরত্তি জিনিস বৈ তো নয়।'

'আচ্ছা আপনারা কখন টের পান যে মূর্তিটা চুরি গেছে?'

'চুরির বোধ হয় এক মিনিট পরেই।'

'তখুনি দর্শকদের সব আটক করে তাদের জামা-কাপড় সার্চ করলেই তো পারতেন।'

'তাও করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি!'

'আপনার কর্মচারীদের জামা-কাপড় সার্চ করেছিলেন?'

'না তা করা হয়নি! তার কারণ যে তিনজন কর্মচারী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং বহুকালের লোক। তাঁদের সন্দেহ করতে গেলে নিজেকেও সন্দেহ করতে হয়। প্রভাতবাবু অবশ্য এজন্যে আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে আমি আদৌ ভুল করিনি।'

মনীশ বললে, 'আপনি এদের যত পারেন বিশ্বাস করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু আমার আসল পরিচয়টা দয়া করে এদের দেবেন না।'

'আরে না না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।—এরা কি রাত্রে এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ। ওঁদের শোবার ঘর তেতলায়। খাওয়া-দাওয়াও ওঁদের এই-খানেই হয়। তোমার সম্বন্ধে অবশ্য কোন রকম বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখতে চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে এখানেও থাকতে পার; আবার না ইচ্ছে করলে অন্য রকম ব্যবস্থাও করতে পার। বিকালের চা-খাওয়াটা আমরা এক সঙ্গেই করে থাকি। ঠিক ছ-টার সময় আমরা চায়ের টেবিলে বসি। ঐ সময় চা খেতে খেতে আমাদের কাজের কথা হয়। তুমি ইচ্ছে করলে ঐ সময় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পার।'

একটু ভেবে মনীশ বললে, 'বিকেলে আপনাদের চায়ের টেবিলে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে দরকার হবে বলে মনে করি। কেননা ঐ সময় ওঁদের তিনজনকেই একসঙ্গে পাবো এবং সে সুযোগে ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টাও হয়ে যাবে।'

আজ তিনদিন হলো মনীশ নবগোপালবাবুর অ্যাসিস্টেন্টের পদে বহাল হয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে ছ-টার সময় নবগোপালবাবুর চায়ের টেবিলে হাজিরে দিতে সে ভোলে না। এর ফলে মিউজিয়ামের কর্মচারী

তিনটির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। তিনজনেরই বয়স ষাটের ওপর। বহুকাল থেকে এই কাজে এঁরা লেগে রয়েছেন। মিউজিয়ামটি এঁদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়। এর উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্যে এঁরা চিরটা কাল প্রাণপণে খেটে এসেছেন এবং এখনও খাটছেন। সত্যিই এঁদের সন্দেহ করতে মন কিছুতেই চায় না।

নবগোপালবাবুর ওখানেই মনীশ তার শোবার ব্যবস্থা করেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে শয্যায় শুয়ে সে ভাবতে লাগলো—কি করা যায় এখন? একটা কোন সূত্র ধরে তাকে এগুতে হবে তো; কিন্তু কোন সূত্রই তার হাতের কাছে নেই। বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগলো—কি ভাবে কাজ সুরু করা যায়?

ভাবতে ভাবতে রাত একটা বাজলো, দুটো বাজলো, তিনটে বাজলো, তবু কোন সূত্রই সে খুঁজে পেল না। এমনি করে আরও একটা ঘণ্টা কেটে গেল। দূরে একটা গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বেজে গেল। হঠাৎ মনীশ লাফিয়ে উঠলো—হয়েছে, হয়েছে, একটা উপায় মাথায় এসেছে। হ্যাঁ, হবার হলে ঐতেই কাজ হবে নিশ্চয়ই। উৎসাহে এবং আনন্দে তার মনটা ভিতরে ভিতরে নেচে উঠতে লাগলো।

পরের দিন বিকাল ছ-টার সময় নবগোপালবাবু চায়ের টেবিলে বসেছেন। তাঁর সামনাসামনি তিনটে চেয়ার দখল করে বসেছেন হরিহর চাটুয্যে, মন্মথ দত্ত আর প্রবোধ মিত্তির, অর্থাৎ মিউজিয়ামের তিনজন প্রধান কর্মচারী। একটা চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে মনীশের জন্যে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হরিহরবাবু বললেন, 'মনীশবাবুকে দেখছি না কেন?'

নবগোপালবাবু বললেন, 'তাকে পাঠিয়েছি একটা কাজে, বোধ হয় আটকে পড়েছে কোথাও।'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হন্তদন্তভাবে মনীশ ঘরে ঢুকলো এবং নিজের চেয়ারটা দখল করে বসেই বলে উঠলো, 'আজ একটা ভারি ইন্টারেস্টিং খবর আছে স্যার।'

একটা সন্দেশ মুখে পুরতে পুরতে নবগোপালবাবু বললেন, 'তাই নাকি! কি খবর শুনি?'

মনীশ সুরু করলে, 'আজ্ঞে, ঘুরতে ঘুরতে বেলা তিনটা নাগাদ ভারি

ক্ষিদে আর তেষ্টা পেয়ে গেল। আমি তখন ধর্মতলার মোড়ে। সমুখেই বেশ বড় গোছের একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়লুম! সব কটা টেবিলই ভর্তি, কেবল ঘরের কোণে একটা টেবিল খালি ছিল, অগত্যা সেইটেই দখল করে বসলুম।'

আপন মনে চা খাচ্ছি, এমন সময় একটি লোক তাঁর নিজের সিট ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে এসে আমার পাশের চেয়ারটাতে বসলেন। আধাবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে মট্‌কার দামী পাঞ্জাবী, হাতে সোনার রিস্টওয়াচ; ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ শুরু করলেন, 'আপনার নামটি শুনতে পাই কি?'

বললুম, 'আমার নাম মনীশ গুপ্ত। কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক একটা চাপা-হাসি ঠোঁটের ডগায় এনে খুব মোলায়েম সুরে বললেন, 'তাহলে আমি বোধহয় নবগোপালবাবুর নবনিযুক্ত অ্যাসিস্টেণ্টের সঙ্গে কথা বলছি?'

বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক একটা মোটা সিগার ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে গলাটাকে অত্যন্ত খাটো করে বললেন, 'আমার ঠিকানা এবং ফোন নম্বরটা দয়া করে টুকে রাখবেন কি?

বললুম, 'কেন বলুন তো?'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'দরকার হতে পারে তো!'

বললুম, 'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আগের মতই খাটো এবং মিহি কণ্ঠে বললেন, 'নবগোপালবাবুর মিউজিয়ামের মহামূল্য জিনিসগুলোর প্রতি যথেষ্ট লোভ আছে, এরকম লোক কলকাতার শহরে দু-চার জন থাকাটা আপনি কি অসম্ভব মনে করেন? অবশ্য তার জন্যে উপযুক্ত খরচ করতেও তারা পিছপা নন। দু-দশ হাজার টাকা তাঁদের কাছে কিছুই নয়, অথচ আপনাদের মত ছাপোষা লোকের কাছে সেটা হয়ত অনেক কিছু, কেমন, নয় কি? যাই হোক, যদি কখনো দরকার বোঝেন, তাহলে…'

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক পকেট থেকে ফাউণ্টেন পেন বের করে একটা কাগজে নাম ঠিকানা এবং ফোন-নম্বর টুকে আমার হাতে দিলেন।

তার পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু পরশু বম্বে রওনা হচ্ছি। যদি কোন কথা থাকে তা'হলে কাল রাত ঠিক ন-টার সময় আমাকে ফোন করবেন। আচ্ছা নমস্কার!'

কথাটা শেষ করেই ভদ্রলোক রেস্তোঁরা ছেড়ে চলে গেলেন। আমি কেমন যেন হতভম্বের মত বসে রইলুম।

নবগোপালবাবু বললেন, 'কই দেখি সেই কাগজটা।' তারপর কাগজটা চোখের সুমুখে মেলে ধরে পড়তে লাগলেন—'নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী —নং ফণী মিত্র লেন, কলিকাতা। ফোন নং ৩৫…।'

কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে নবগোপালবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হরিহরবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আমাকে একটু উঠতে হোলো। মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন···আপনারা বসুন, আমি একটু···!'

নবগোপালবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! কাউকে ডাকবো নাকি?—সঙ্গে যাবে?'

'না, না, দরকার হবে না, আমি নিজেই ঠিক যেতে পারবো!' বলেই ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইদিনই রাত্রে মনীশ গিয়ে দেখা করলে প্রভাতবাবুর সঙ্গে। তাকে দেখেই প্রভাত গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, 'আজ নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে?'

'কি করে জানলেন স্যার?'

'তোমার মুখের চেহারা সে কথা আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে! কোন সূত্রটুত্র পেলে নাকি হে? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঐ চেয়ারটাতে ভাল করে বস।'

চেয়ারে বসে মনীশ বললে, 'আজ্ঞে সূত্রটুত্র কিছুই পাইনি, তবে সূত্র একটা নিজেই বানিয়ে নেবো ঠিক করেছি। আপনাকে কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কিছুই বলব না স্যার।'

'কিছুই বলবে না?'

'আজ্ঞে না। আমাকে দয়া করে নিজের মত কাজ করতে দিন স্যার। কিছু মনে করবেন না তো? তাহলে অবশ্য....'

বাধা দিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলী বললেন, 'আরে না, না, কিছুই মনে করব

না। তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? নিজের ওপর বিশ্বাস থাকাই তো দরকার।'

উৎসাহ পেয়ে মনীশ বলে উঠলো, 'আপনাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে স্যার।'

'কি কাজ বল।'

'কাল রাত ঠিক নটার সময় এক জায়গায় আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

'বেশ, ভাল কথা। আর কিছু করতে হবে আমাকে? হুকুম কর।'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মনীশ বললে, 'কি যে বলেন স্যার, তার ঠিক নেই, আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন?'

একটু হেসে প্রভাত গাঙ্গুলী বললেন, 'আরে না না, ঠাট্টা করতে যাবো কেন? চিয়ার্ আপ্, ইয়ং সোলজার। এই তো চাই। নিজের বুদ্ধির ওপর আস্থা না থাকলে কেউ কখন বড় হতে পারে? এখন তোমার বক্তব্য বলে দাও দেখি।

'আজ্ঞে রাত ঠিক ন-টার সময় আমার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে একজন ফোন করবে, আপনাকে নয়, অন্য একজন লোকের নামে।'

'বেশ, তারপর?'

'যে নামেই ফোন করুক, আপনি জানাবেন আপনিই সেই লোক এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনার নাম কি মনীশ গুপ্ত?' উত্তর আসবে, 'না, আমার নাম মনীশ গুপ্ত নয়, আমার নাম অমুক।' তারপর লোকটি আপনাকে জানাবে যে সে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চায়। আপনি খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলবেন, 'বেশ, আপনার জিনিস নিয়ে এখুনি চলে আসুন, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম।—আপনি হাসছেন স্যার?'

'না না, হাসতে যাবো কেন? আমি তোমার হাতমুখ নাড়ার সুন্দর ভঙ্গিটি উপভোগ করছিলুম।'

'আপনি তা'হলে আমার কথা মন দিয়ে শোনেন নি?'

প্রভাত গাঙ্গুলী মুখে বললেন বটে যে মনীশের কথা তিনি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছেন, আসলে কিন্তু তিনি এই ছেলেটির

ছেলেমানুষী এবং তার চেয়ে তার সরল আত্মবিশ্বাসটুকু বেশি করে উপভোগ করছিলেন।

পরদিন রাত ন-টার কিছু আগে প্রভাতবাবুকে মনীশ তার আত্মীয়ের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। ঠিক ন-টার সময় ঝন্-ঝন্ করে টেলিফোন্-যন্ত্রটা বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলী হাঁকলেন, 'হ্যাল্লো—কে আপনি? —হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন কি বলবার আছে। কি বললেন?—একটা জিনিস আমাকে দেখাতে চান,—আজই, এখুনি?—তো।—আপনার নাম—মনীশ গুপ্ত?—কি বললেন?—আপনি মনীশ গুপ্ত নন?—বেশ, বেশ।—নামেতে কি আসে যায়।—তা'হলে আপনি আপনার জিনিস নিয়ে এখুনি চলে আসুন,—হ্যাঁ, এখুনি—আচ্ছা নমস্কার।'

আধ ঘণ্টাও বোধহয় কাটেনি, হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে দরজার সম্মুখে দাঁড়ালে মনীশ বললে, 'আমি পাশের ঘরে রইলুম স্যার। ঠিক সময় বুঝে এসে হাজির হবো।'

পরক্ষণেই উড়ে বেয়ারার পেছনে পেছনে একটি বৃদ্ধ লোক ঘরে ঢুকলেন হাতে তাঁর একটা টিনের কৌটো। প্রভাতবাবু তাঁকে খাতির করে বসালেন। ভদ্রলোক ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'জিনিসটা নির্ভয়ে দেখাতে পারি বোধহয়?'

'সম্পূর্ণ নির্ভয়ে, এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। শুধু আপনার জন্যেই নয়, আমার নিজের জন্যেও যথেষ্ট সাবধান হবার দরকার আছে, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

অতঃপর টিনের কৌটোর ভিতর থেকে যে জিনিসটি বেরুলো, তার দিকে চেয়ে প্রভাতবাবু অবাক হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য! এ যে নবগোপালবাবুর সেই নীলার বুদ্ধমূর্তি!

এই সময় সহসা পাশের ঘরের পর্দাটা হঠাৎ সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলো মনীশ।

সেইদিক পানে একবার মাত্র চেয়েই বৃদ্ধলোকটি বিদ্যুৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মৃদু হেসে মনীশ বললে, 'এই যে হরিহরবাবু, তারপর, ভাল আছেন তো? হঠাৎ এখানে কি মনে করে?'

ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কেবল একটিমাত্র কথা, 'শয়তান !'

পরের দিন সকালে নবগোপালবাবুর অফিসঘরে নবগোপালবাবু এবং প্রভাত গাঙ্গুলী সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসে কথা কইছিলেন। আর একটা চেয়ারে বসেছিল মনীশ গুপ্ত।

নবগোপালবাবু মনীশের দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা তুমি কি হরিহর-বাবুকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে ?'

মনীশ বললে, 'আজ্ঞে না, বরং ওঁর ওপর আমার গোড়ায় সন্দেহই হয়নি। ওঁর ওপর প্রথম সন্দেহ হলো সেই দিন, যেদিন রেস্তোরাঁর সেই কাল্পনিক লোকটির কথা আপনাদের কাছে বানিয়ে বলি। আপনার মনে আছে বোধ হয়, যেই আপনি আমার কাছ থেকে ভদ্রলোকের ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটা চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর চেঁচিয়ে পড়লেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই হরিহরবাবু অসুস্থতার অছিলা করে ঘর ছেড়ে উঠে গেলেন। মনে পড়ছে বোধ হয় আপনার ?'

'হ্যাঁ, খুব মনে পড়ছে। কিন্তু তা থেকে তাঁর ওপর সন্দেহ করবার কি আছে তা তো বুঝতে পারলুম না।'

একটু হেসে মনীশ বললে, 'ঠিক ঐ রকম একটা কিছুই আমি আশা করেছিলুম। আমি জানতুম চায়ের দোকানের কাল্পনিক ভদ্রলোকটির ঠিকানা এবং ফোন নম্বর শোনবামাত্রই আপনার তিনজন কর্মচারীর মধ্যে একজন না একজন ঘর ছেড়ে উঠে যাবেন। কারণ নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর, এতগুলো জিনিস একবার শুনে টাটকা-টাটকি মনে রাখা হয়ত কঠিন নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অতগুলো জিনিস গোল পাকিয়ে যেতে পারে, সুতরাং যদি কেউ ওগুলোকে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে কোনো কাগজে বা খাতায় টুকে ফেলা, নয় কি ?'

প্রভাত গাঙ্গুলী এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন, এইবার আপন মনেই বলে উঠলেন, 'সাবাস ছোকরা !'

মনীশ বলে চললো, 'আমি তখুনি বুঝেছিলুম, ভদ্রলোক কাল রাত্তিরেই ফোন করবেন। কেননা, আপনার মনে আছে বোধ হয়, আমি আগেই জানিয়ে রেখেছিলুম, ভদ্রলোক কালই বম্বে চলে যাচ্ছেন।'

সব কথা শুনে নবগোপালবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, 'আমি যদি মনীশকে আমার কাছে রাখি, আপনার আপত্তি আছে কি প্রভাতবাবু? মাইনেটা যাতে ওর মতন প্রতিভাবান ছেলের উপযুক্ত হয়, সেদিকে অবশ্য আমার দৃষ্টি থাকবে।'

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে প্রভাত গাঙ্গুলী বললেন, 'আমি কিন্তু ওকে ছাড়তে পারি না নবগোপালবাবু। ওর প্রতিভা আপনার মিউজিয়ামের জন্যে নয়, ওর প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাবে আমার সঙ্গে কাজ করলে, নয় কি?

আশ্চর্য ব্যাঙ্ক ডাকাতি

লীলা মজুমদার

এ গল্পটা আমি মোটেই বানাইনি, একেবারে সত্যি ঘটনা, শুধু নামধাম দিয়েছি। পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার। অ্যামেরিকায় বেন ষ্টিল বলে একজন পাইলট হঠাৎ মহা মুশকিলে পড়ে গেলো। তার কাজ হলো এরোপ্লেন চালানো, কিন্তু যে কোম্পানিতে সে ছিলো, সেখানে লোক ছাঁটাই হলো; মাঝখান থেকে ওর চাকরিটি গেলো। বিশেষ পয়সাকড়িও নেই, অথচ মানুষটি খুব শৌখিন। বয়স বছর পঁচিশ; আত্মীয়স্বজন আছে, তবে তারা অনেক দূরে থাকে, ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে। আর তাদের কাছে বিশেষ সাহায্য পাবে বলেও মনে হয় না। তার চেয়ে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কিছু করলে ঢের ভালো হয়।

এই মনে করে বেন ষ্টিল বুদ্ধি খাটাতে বসলো। বুদ্ধি মানেই বদবুদ্ধি। টাকার চেষ্টাই যখন হচ্ছে, তখন হঠাৎ গাদা-গাদা টাকা করে ফেলার একটা উপায় বের করতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! পুরোনো নীল রঙের রেনো গাড়িটা চেপে বেন শহরের গলিতে-ঘুঁজিতে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, যদি কোথাও একটা সুবিধে পাওয়া যায়।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওয়াশিংটন ব্যাংকের ব্রাঞ্চ অফিসের ওপর চোখ পড়লো। ধক্ করে মনে হলো, এই সব জায়গাতেই তো লক্ষ লক্ষ টাকা

থাকে, একবার যদি কোনোমতে সেগুলোর নাগাল পাওয়া যায়, তাহলে আর কোনোদিনও চাকরি চাকরি করে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

এ ব্যাঙ্কটা কিন্তু বেশ। চারিদিকে সাধারণ অবস্থার লোকদের বাড়িঘর, ছোটো ছোটো কারখানা, সারা দিন পথঘাটে লোকের ভিড়, কিন্তু একটু সন্ধ্যা হলেই সব ভোঁ-ভোঁ; আর রাত বাড়লে তো ভূতের পুরী!

ব্যাঙ্কের পেছনেও একটি ঢুকবার পথ আছে। তার পেছনেই একটা উঁচু বাঁধের মতো, তার পেছনে খোলা জমি, ঝোপঝাপ আগাছায় ভর্তি, দিনের বেলাতেও এখানে কেউ বড়ো একটা আসে না। কোনো মতে যদি এই জংলি জায়গাটা থেকে বাঁধের তলা দিয়ে, ব্যাঙ্কের পেছনে ? পথের নিচে দিয়ে, ব্যাঙ্কের ভিতের তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়া যায়, তা হলেই তো ল্যাঠা চোকে। একেবারে ব্যাঙ্কের তলা ফুঁড়ে যে-সব মাটির তলাকার গোপন ঘরে লোকদের টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, হীরে-মণি, দলিলপত্র লুকিয়ে রাখা হয়, তার মাঝখানে ওঠা যাবে। তারপর আর ভাবনা কিসের, ইচ্ছেমতো পকেট, থলি-ঝুড়ি বোঝাই করে, আবার সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে নীল রেনো গাড়ি চেপে কেটে পড়লেই হলো। বেন ষ্টিলকে কেউ সন্দেহও করবে না, কারণ তাকে সবাই চেনে, সবাই জানে, বেন বড়ো ভালো, বড়ো ভদ্র, বরং একটু গোবেচারা গোছের।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। আগে কখনো বেন মাটি খোঁড়েনি, কিন্তু তাতে পেছপাও হলে চলবে কেন ? বেন কাজ শুরু করে দিলো। ঐ বাঁধটাই হলো ব্যাঙ্কের এলাকার সীমানা। তার বাইরে আগাছায় ঢাকা খোলা জমিতে, ব্যাঙ্ক থেকে কিছু দূরে, রাত্তির বেলায় একটা নীল রেনো গাড়ি, ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে কারো চোখে না পড়বারই কথা। সুড়ঙ্গের মুখটাও তেমনি বাঁধের বাইরে এবং ঝোপেঝাপে আড়াল করা। রাতে যে সব পাহারাওয়ালাদের ব্যাঙ্কের চারদিকে টহল দেবার কথা, তারা কিছু টেরও পেলো না।

তবু কাজটা মোটেই সহজ নয়। খুঁড়তে খুঁড়তে যখন সাত-আট ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ হয়েছে মাটির চাপে তার ছাদটা ভেঙে পড়লো। বেন তাতে একটুও ঘাবড়ালো না। শহরের বাইরে অচেনা দোকান থেকে ফোন করে কাঠ কিনে, তাই দিয়ে গভীর রাতে সুড়ঙ্গের ছাদে ঠেকা দিয়ে খুঁড়ে চল্‌লো। খোঁড়া মাটিগুলো কোথায় ফেলে সেও একটা সমস্যা। ওখানে

ঢিপি করে রাখলে লোকের চোখে পড়তে কতোক্ষণ? একটা চ্যাপ্টা বোর্ডের ওপর মাটি জমা করে রোজ গাড়িটাতে তুলে দূর দূর জায়গায় নিতে হলো।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে লাগলো। ব্যাঙ্কের মধ্যে সারাদিন যারা খাটতো আর ব্যাঙ্কের বাইরে যারা পাহারা দিতো, কেউ ঘুণাক্ষরে টেরও পেলো না যে মাটির তলা দিয়ে ব্যাঙ্কে চোর সেঁধোচ্ছে। বেন সারারাত মাটি খুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে, নিশ্চিন্ত নিরাপদে সারাদিন ঘুমোতো।

এইভাবে সোজা আঠারো ফুট খুঁড়ে বেন সুড়ঙ্গটাকে ত্যারচাভাবে ওপর দিকে তুলতে লাগলো, মনে বড়ো আশা যে কোনো রাতে একেবারে ব্যাঙ্কের ভিতরকার মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বে, পড়লোও তাই একদিন, কিন্তু ব্যাঙ্কের আসল ঘরে নয়, তার নিচে চার ফুট উঁচু একটা জায়গায়, এইখান দিয়ে মিস্ত্রিরা ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি আর ড্রেন মেরামত করবার জন্য যাতায়াত করে। টর্চ নিয়ে অনুসন্ধান করে বেন একটা লোহার সিঁড়ি আবিষ্কার করলো, তার মুখে একটা ঢাকনা দেওয়া। ঢাকনির ওপরে উঠে দেখে এই তো ব্যাঙ্কের চুল্লিঘর, এর কাজ বাড়িটাকে গরম রাখা, যা শীত ওসব দেশে।

চুল্লিঘরের পাশেই ব্যাঙ্কের ভল্ট। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা, সোনা-দানা, হীরে-মণি-মুক্তো, দলিলপত্র লুকোনো থাকে। ভল্টের মেঝেটা আঠারো ইঞ্চি পুরু সিমেন্টের তৈরি। সাধারণ হাতুড়ি বাটালির কম্ম নয় সে মেঝেতে ছ্যাঁদা করা। ঠাণ্ডা মাথায় খানিক ভেবেচিন্তে, পরদিন লোহার যন্ত্রপাতির দোকানে গিয়ে বেন কংক্রিট ছ্যাঁদা করবার ইলেকট্রিকের হাতুড়ি আর ড্রিল দেখে এলো এবং রাত্রে দরজা ভেঙে ঢুকে ঐ দু'টি নিয়ে এলো। তারপর আর কি, মাটির নিচে মিস্ত্রিদের কাজ করবার জন্য বহু প্লাগ-পয়েন্ট ছিলো, তাতে ড্রিল আর হাতুড়ি প্লাগ করে কাজ শুরু হয়ে গেলো। সে ড্রিলের শব্দে বেনের কান ঝালাপালা, প্রাণ আইঢাই। এই বুঝি চারিদিক থেকে পুলিশ ছুটে এলো। আশ্চর্যের বিষয়, বাইরে কোনো শব্দ পৌঁছোলো না, পাহারাওয়ালারাও কিছু টের পেলো না।

এদিকে দেখতে দেখতে দু'মাসের ওপর কেটে গেছে বড়োদিনের ছুটি এসে গেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বেনেরও বিশ্রাম দরকার হয়ে

পড়েছে। কাজেই তখনকার মতো কাজকর্ম বন্ধ রেখে সে দিব্যি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে এলো। তাদের ধারণা, বেন এখনো কোম্পানির এরোপ্লেন চালায়, ভীষণ খাটতে হয়।

ছুটির পর, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার আশায় বেন এক নতুন মতলব ঠাওরালো। শহর থেকে ষাট মাইল দূরে গিয়ে পঁচিশ ডলার খরচ করে খানিকটা ডিনামাইট কিনে আনলো। তারপর লাইব্রেরিতে বই ঘেঁটে ডিনামাইট দিয়ে কি করে পাথর ফাটাতে হয়, তার নিয়মকানুন শিখে নিলো। এইসব করতে আরো দেড় মাস কেটে গেলো। তারপর ডিনামাইট বসানো শুরু হলো। ভল্টের তলাকার সিমেণ্টে ফুটো করে ডিনামাইট ভরা হলো, যেটুকু ধুলোবালি নিচে পড়লো, পাশের ঘর থেকে হোস্ পাইপ এনে সে সব ধুয়ে মুছে সাফ করা হলো। তারপর একদিন ডিনামাইটে ফিউজ জ্বালিয়ে, বেন মাটির তলায় অন্য ঘরে গিয়ে বসে রইলো। একটু বাদেই বাড়ি কাঁপিয়ে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ হলো, সমস্ত বাড়ি কেঁপে উঠলো, ব্যাঙ্কের ঘরে এখানে ওখানে প্লাষ্টারে সরু সরু ফাটল ধরলো, কিছু চুন বালি খসলো। তাই দেখে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বলেন, পাশেই এয়ার-পোর্ট, ওখানে জেট প্লেন ওঠানামা করে, তাতে মাটি কাঁপে, তাই এরকম হচ্ছে। তাছাড়া ওপর তলায় একটা ভারি কাগজকাটা কল আছে, তাতে বাড়ি কাঁপে, ঐটেকে বন্ধ করা দরকার।

এদিকে বেন দেখে, এতো করেও মাত্র পাঁচ ইঞ্চি কংক্রিট ছ্যাঁদা হয়েছে। তার পরদিন ছিলো একটা শুক্রবার, শনি ও রবি দু'দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ, এর মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে। রাত এগারোটায় সে আবার সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে, আরো অনেকগুলো ছ্যাঁদা করে, বেশি করে ডিনামাইট পুরে, ফিউজ লাগিয়ে খচমচ করে একেবারে সুড়ঙ্গের বাইরে এসে দাঁড়ালো। খানিক বাদে সে কি বিস্ফোরণ! বেন আর অপেক্ষা না করে গাড়ি চেপে সটান বাড়ি! এবার নিশ্চয় পুলিশরা ব্যাঙ্ক ঘেরাও করে ফেলবে।

আশ্চর্যের বিষয়, তবু পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারলো না, নিজেদের মধ্যে শুধু একটু বলাবলি করলো যে, এ সব ঐ জেট প্লেনের কাজ। পর-দিন বিকেলে ভয়ে ভয়ে বেন অকুস্থলে ফিরে গিয়ে দেখে সব যেমনকে তেমন, কেউ কোথাও নেই। খালি দু'জন কেরানি এক্সট্রা টাইম কাজ করতে এসে এই বলে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলো যে নিশ্চয় মিস্ত্রিরা কাজ করে ঘরদোর পরিষ্কার না করেই চলে গেছে; চিরকেলে

ফাঁকিবাজ ইত্যাদি।

রাত বারোটার একটু আগে বেন ষ্টিল সুড়ঙ্গ দিয়ে আবার ব্যাঙ্কে ঢুকলো। ঢোকাই মুশকিল, চারদিকে ভাঙা ইট-পাথর ছড়ানো, ভেতরে গিয়ে কি দেখলো কে জানে, ভেতরে গিয়ে কিন্তু সে আহ্লাদে আটখানা! ভল্টের মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা মানুষ ঢুকতে পারে এতো বড়ো একটা ফুটো! এখানে ওখানে অ্যালার্ম বেল লাগানো, কোনোটার কিচ্ছু হয়নি, শুধু বেন ষ্টিলের ঢুকবার রাস্তা হয়েছে।

ভল্টে ঢুকে স্ক্রু-ড্রাইভারের সাহায্যে দেরাজ আলমারি সব খুলে ফেললো। সারারাত ধরে নোট, টাকাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে ঝোলা ভরে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে তোলে। ভোর হবার আগেই হাজার হাজার ডলারের নোট নিয়ে নীল রেনো চালিয়ে বেন ষ্টিল সরে পড়লো।

টাকাকড়ির বেশির ভাগ একটা জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে রেখে পরদিন রাতে বেন আবার অকুস্থলে ফিরে এলো। এবার সমস্ত জায়গাটিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, পাছে কোনো যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র ফেলে রেখে গিয়ে থাকে, যা দেখে পুলিশ ওকে খুঁজে বের করতে পারে। শেষ অবধি কোথাও কিছু নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে, শেষ বারের মতো সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে বেন ষ্টিল বাড়ি চলে গেলো। সেদিন ছিলো রবিবার! তারপরের দিন সোমবার, সকাল পৌনে-ন'টায় ব্যাঙ্ক খুলে ম্যানেজারের চক্ষুস্থির! অমনি হৈ-হৈ পড়ে গেলো। কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! বাঁধের বাইরে থেকে সুড়ঙ্গ কেটে, ভল্টের তলায় ছ্যাঁদা করে, টাকা চুরি! এ যে তাজ্জব ব্যাপার! খুব পাকা অভিজ্ঞ চোর ছাড়া কারো পক্ষে এমন কাজ সম্ভব নয়। নামকরা দাগী চোরদের মধ্যে খুব ধরপাকড় চলতে লাগলো ; ব্যাঙ্ক চোরের কোনো হদিস পাওয়া গেলো না।

কিন্তু অন্যায় কাজ করে পার পাওয়া অতো সহজ নয়! এতো দিন ধরে এতো কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে বেন ষ্টিলের মুণ্ডুটি ঘুরে গেলো। তাতেই তার কাল হলো। তার ধারণা পুলিশ কখনোই তাকে সন্দেহ করতে পারে না। ঐ শহরের অন্য মাথায় আরেকটা ব্যাঙ্কে বেন অনেক টাকা জমা রাখলো, একটা বাড়ি কিনবার জন্য বায়না দিলো, একটা স্টেশন-ওয়াগনের জন্য নগদ এক হাজার ডলার দিলো।

এদিকে পুলিশও চারদিকে নজর রাখছিলো, কে কোথায় হঠাৎ কাঁচা টাকা ছাড়ছে। ব্যাঙ্ক থেকে যে সব নোট চুরি গিয়েছিলো, তার নম্বর

ব্যাঙ্কে টোকা ছিলো। সেই ফর্দ থেকে নোটের নম্বর মিলিয়ে স্টেশন-ওয়াগনের দোকানে চোরের হদিস পাওয়া গেলো। দেখতে দেখতে বেন ষ্টিলের বাড়ি চড়াও করে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। বিচারে বেন ষ্টিলের কুড়ি বছর জেল হলো। তার এতো বুদ্ধি, এতো যত্ন, এতো পরিশ্রমের ফল শেষ পর্যন্ত এই হলো! এখন সে জেলে নিজের বোকামির কথাই ভাবে।

তেরো নম্বর বাড়ীর রহস্য

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

ব্যাপারটা ঘটেছিল এক পূজার বন্ধে; হুকাকাশি গিয়েছিলেন শিলং, আর রণজিৎ ভাড়া নিয়েছিল কলকাতারই সহরতলিতে একটা বাগানঘেরা সুন্দর বাড়ী। রণজিতেরই জিৎ হল, কেননা হুকাকাশি জানালেন, অনবরত বৃষ্টির চোটে তাঁর চেঞ্জ মাথায় উঠেছে, আর কোথাও যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। রণজিৎ তাঁকে তার নিরিবিলি বাড়ীখানাতে দিন কতক এসে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করল, হুকাকাশিও শিষ্ট ছেলের মত ফিরে এলেন।

হুকাকাশিকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য রণজিৎ স্টেশনে উপস্থিত ছিল। গাড়ী করে বাড়ী আসবার পথে হুকাকাশি বরাবর লক্ষ্য করলেন, রণজিৎ যেন বেশ একটু গম্ভীর, যেন কিছু চিন্তান্বিত!

'ব্যাপার কি রণজিৎবাবু, আজ আপনার নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে!' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, দেশটা দিনকে দিন আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল নাকি তাই ভাবছি।'

'কি রকম, লোকগুলো হঠাৎ খুব ফর্সা হয়ে যাচ্ছে নাকি? নাকি গঙ্গার ধারে ছাপ্পান্ন-তলা-বাড়ীর ভিত গাঁথা হচ্ছে?'

'ও দু'টোর কোনটাই ভয়ের কথা নয়, কাজেই ওর জন্য চিন্তিত হবার কারণ নেই। কিন্তু ইয়াঙ্কি গুণ্ডারা যে ছেলে ধরে এনে তাকে লুকিয়ে রেখে আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি পাঠায়—'পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলবে তো ফেল, নয়তো ছেলে ফিরে পাবার আশা ছাড়'—আমাদের দেশেও যদি এই ধরণের গুণ্ডামির চলন হয়, তবে একটু ভাববার কথা হয়ে পড়ে বৈকি!'

'কথাটা আরএকটু সোজা ভাষায় বলুন রণজিৎবাবু। দুনিয়ার হালচাল দেখে আপনি কি একটা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করছেন, না কি বাস্তবিকই ওই ধরনের কোন ব্যাপার আপনার নজরে এসেছে?'

'দেখুন, আপনি দু'দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছেন, এখানে একটা জটিল কেস আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে স্বভাবতঃই আমার দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু পরশু রাত্রে যে অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমার মনে গুরুতর সন্দেহ জেগে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, সমস্ত জেনেশুনেও যদি চুপ করে থাকি, ভগবান হয়তো সইবেন না। ব্যাপারটা খুলে বলি, শুনুন···এখানে যে পাড়াটিতে আমি বাড়ী নিয়েছি সেটা খুবই নিরিবিলি, লোকজনের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে। আমার বাড়ীর কাছেই আর একটা ছোট মত একতলা বাড়ী, ও রাস্তার তেরো নম্বরের বাড়ী—আসা অবধি খালিই পড়ে আছে দেখছি। অনেক দিন থেকেই নাকি খালি আছে। পরশুদিন সারাক্ষণটাই বেশ গুমোটে গিয়েছিল ; অনেক রাত পর্যন্তও কিছুতে যখন ঘুম এল না, তখন দরজা খুলে বাড়ীর দক্ষিণ দিকটার বারান্দায় গিয়ে বসলাম—যদি কিছু বাতাস পাওয়া যায় সেই আশায়। বসে আছি প্রায় মিনিট পাঁচেক, হঠাৎ মনে হল তেরো নম্বর বাড়ীটা থেকে কেমন একটা কাতর গোঙানির আওয়াজ আসছে। আস্তে আস্তে আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, কে যেন অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করছে—'বাবা গো গেলুম ! আমি আর পারি না—এর চেয়ে তোমরা আমায় মেরে ফেলে একদম মুক্তি দাও—মুক্তি দাও। ওই ছুরিখানা আমার পেটে ঢুকিয়ে দাও, এ নরক-যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারি না।'

'ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি, তৎক্ষণাৎ ওই অবস্থাতেই নীচে নেমে এলাম—ও বাড়ীটাতে গিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারখানা কি। ওখানে গিয়ে কিন্তু বিস্ময় আমার শতগুণ বেড়ে গেল ; সামনের দিককার সমস্ত জানলা-কপাট বন্ধ, আর সদর দরজায় ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা তালা। দেখলে স্বভাবতঃই মনে হবে যে ওই বাড়ীটাতে কেউ যে বসবাস করছে, ভেতরের লোকেরা বাইরের কাউকে তা বুঝতে দিতে চায় না। এ অবস্থায় আর ভোর না হওয়া অবধি হঠাৎ কিছু করা উচিত হবে না ভেবে সে রাত্তিরের মত চলে এলাম। তারপর সকালে গিয়ে দেখি তালাটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে দরজা বন্ধই রয়েছে। আমি বারান্দায় গিয়ে উঠতেই একটা ইতর চেহারার নিম্ন শ্রেণীর লোক বার হয়ে এল, আমার পা থেকে মাথা অবধি বার দু'তিন বেশ করে দেখে নিয়ে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি চাই এখানে ?'

'তোমরা বুঝি এ বাড়ীটাতে নতুন ভাড়াটে এসেছো ?'

'লোকটা সন্দেহের চক্ষে আমার আপাদমস্তক দেখে বললে, হুঁ।'

এরপর কোন কথাই যেন আমার মনে এল না, কি বলে আলাপ আরম্ভ করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা আমার মুখের উপরই ঝপ্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমারও মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল— ভেতরের লোকদের কোন কথাবার্তা শোনা যায় কি না একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। তৎক্ষণাৎ খুব ঘটা করে চটি জুতোর শব্দ শুনিয়ে শুনিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম, তারপর চটি বাইরে রেখে, পা টিপে চুপি চুপি বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়ালাম, কপাটের গায়ে কান লাগিয়ে। শোনা গেল, কে একজন ফিস্ ফিস্ করে অপর আর একজনকে শাসাচ্ছে 'হুঁসিয়ার! কেউ টের পেলে সবশুদ্ধ মারা পড়ব—শুধু আমি একা নই, তোরাও বাদ পড়বি না। পেছনের দুয়ার……' তার পরের কথাগুলো আর কানে এল না, তবে জেলখানার কথাটার উল্লেখ যেন শুনতে পেলাম বলে মনে হল। তক্ষুনি আমি থানায় গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিয়ে আসতাম, যদি না জানা থাকত আজই আপনি এসে পৌঁছুচ্ছেন।…কি রকম মনে হয় আপনার ব্যাপারটা?

বিকালের দিকে, বেলা নাগাদ পাঁচটায় রণজিৎকে সঙ্গে করে হুকাকাশি তেরো নম্বরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফটক থেকে ছোট্ট একটা লাল সুরকির রাস্তা বাড়ীর সামনে দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে আবার ফটকের কাছে চলে এসেছে। সেটুকু পার হলেই বারান্দা। ওঁরা গিয়ে সেই বারান্দায় উঠতেই সকাল বেলাকার সেই চাকরটা ভিতর থেকে বেরিয়ে এল; তারপর সেই সকাল বেলাকারই প্রশ্ন—'কি চাই এখানে?'

'কর্তা আছেন? আমরা এই পাড়ারই লোক, আলাপ-পরিচয় করতে এসেছি।' হুকাকাশি বললেন।

'এখন দেখা হবে না, তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

রণজিৎ আড়চোখে একবার হুকাকাশির দিকে চাইল, বোধ হয় আশ্বিন মাসের বেলা পাঁচটা যে ঘুমোবার পক্ষে প্রশস্ত সময় নয় সেই তথ্যটুকুই স্মরণ করিয়ে দিতে। কিন্তু চাকরটার ভাবভঙ্গী খুবই সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়বার আর কোন বাক্যব্যয় না করে ওবেলার মত এ বেলাও ঝপ করে সে দরজা বন্ধ করে দিল। অগত্যা রণজিৎদের ফিরতে হয়।

রাত তখন বোধ করি বারোটা, সমস্ত সহর নিঃঝুমে, অকাতরে ঘুমাচ্ছে, হঠাৎ হুকাকাশির শোবার ঘরে বার কতক কড়া নাড়ার আওয়াজ হল।

'কে ?' হুকাকাশি প্রশ্ন করলেন।

'আমি রণজিৎ। শীগ্‌গির দোর খুলুন, খবর আছে।'

হুকাকাশি উঠে এসে দরজা খুলে দিতে দিতে বললেন, 'খবর আমি জানি, মানে কাৎরানি আর গোঙানির শব্দ আমারও কানে আসছে।'

'তা হলে এখন আমাদের কি কর্তব্য ?'

'চুপটি করে শুয়ে থাকা, মানে ভোরের জন্য অপেক্ষা করা।'

পরদিন প্রাতঃকৃত্য এবং চা-পানাদি শেষ করে হুকাকাশি একবার দক্ষিণ দিকের বারান্দাটা ঘুরে এলেন। তারপর বললেন, 'চলে আসুন রণজিৎবাবু, কর্তাগোছের এক ব্যক্তি বারান্দার ওপরে সশরীরে দেখা দিয়েছেন। দেখা তো দিতেই হবে, কাল দু-দু'বার পাড়া পড়শীরা খোঁজ নিতে এসেছিল শুনেছে, এর পরেও দরজা এঁটে বসে থাকলে যে নিজে থেকেই নিজের ওপর গুরুতর সন্দেহ ডেকে আনা হবে। আসুন, এই সুযোগে ওকে একটু নাড়া দিয়ে আসা যাক।'

খুব বেশীক্ষণ নাড়া দেওয়া কিন্তু সম্ভব হল না, মিনিট পনেরো পরেই দু'জনাকে ফিরতে হল। হুকাকাশি একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখে কি রকম মনে হল লোকটাকে ? দেখি আপনার পর্যবেক্ষণ শক্তিটা।'

রণজিৎ হেসে বললে, প্রথমতঃ মাথার চুলগুলো খাড়া-খাড়া, দ্বিতীয়তঃ ডান হাতের গেঞ্জির হাতটা নীচের দিকে বার বার টেনে দেয়, তৃতীয়তঃ— তৃতীয়তঃ কি ? আপনিও দু'চারটা বলুন না।'

'বেশ তো বলছিলেন, বলে যান না—তৃতীয়তঃ কাল রাত গোটা তিনেকের সময় ওর বাড়ীতে মোটরে করে লোক এসেছিল···'

'কই, তা' তো বুঝতে পারিনি, আপনি টের পেলেন কি করে ?'

'অতি সহজ উপায়ে ; কাল মাঝ রাত্রের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ওই তেরো নম্বর বাড়ীর সামনে ভিজে সুরকির রাস্তার উপর মোটরের চাকার দাগ এখনো পর্যন্ত দিব্যি খাঁজ কাটা অবস্থায় রয়ে গেছে, কাল বিকেলে এ দাগ ছিল না। তা ছাড়া মোটরের কলকব্জাও ছিল কিছু খারাপ, খানিকটা লুব্রিকেটিং অয়েল তাই চুঁইয়ে পড়েছে। রাস্তার সমস্ত জল একদম শুকিয়ে গেছে, কেবল ওই তেলের নীচেই একটুখানি জল এখনও চিক্ চিক্ করছে, শুকোতে পায়নি। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাকে যে বৃষ্টি ধরার খুব পরে মোটর আসেনি।'

রণজিৎ খুব আশ্চর্য, এবং বোধ করি একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল, 'তবে তো প্রকাণ্ড একটা সুযোগ হারিয়েছি আমরা কাল রাত্রে।'

হুকাকাশি হেসে বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না, মোটর পালিয়ে যাবে না, আজ রাত্রেও নিশ্চয় ওটা এসে হাজির হবে। আপনি শুধু একটা টর্চের ব্যবস্থা রাখবেন।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রণজিৎ হুকাকাশিকে এসে পাকড়াও করল, 'আপনার টেবিলের ওপর আধ ছটাকটাক নুন এল কোত্থেকে মিষ্টার হুকাকাশি?'

'ও ওই তেরো নম্বর বাড়ীর নুন; দেখবেন তরকারীতে চালিয়ে দেবেন না যেন!'

'তেরো নম্বর বাড়ীর নুন? এল কি করে?'

'আজ সকালে যখন কর্তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যাই, তখন সিঁড়ির নীচে ন্যাকড়ায় জড়ানো অবস্থায় ওটুকু পাওয়া গেছে। আপনি টের পাননি, জুতো খুলে পায়ের আঙ্গুলে করে ওটা আমি তুলে নিয়েছিলাম।'

পরদিন সকালে উঠে রণজিৎ চাকরের মুখে শুনতে পেল হুকাকাশি নাকি খুব ভোরেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হতে পারে। খুব বেশী দেরি কিন্তু হল না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন সঙ্গে একেবারে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। চাকরকে তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানাপত্রগুলি তাতে তুলতে বলে রণজিতের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, আমায় মাপ করবেন রণজিৎবাবু, দিন কতকের জন্য একটা হোটেলে গিয়ে আমাকে উঠতেই হবে। তবে যত শীগ্‌গির সম্ভব ফিরে এসে ফের আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব, কথা দিয়ে যাচ্ছি।'

হুকাকাশির নিষেধ ছিল, তাই রণজিতের হাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন আর তাঁর হোটেলে সে যায়নি, কিন্তু পরদিন দুপুরেই এসে সে উপস্থিত হল। হুকাকাশি তখন বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে একখানা টাইম-টেবিলের পাতা উল্টাচ্ছিলেন।

হোটেলের চারধারটা একবার দেখে নিয়ে রণজিৎ বলল, 'আপনার রুম অবশ্য মন্দ নয়, তবে আলো-বাতাসের দিক থেকে দেখতে গেলে পাশের কামরাটা আরও ভাল। ওটা তো তালাবন্ধ দেখছি, কেউ আছে নাকি?'

'কেন, উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? থাকতে হবে কিন্তু 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' অবস্থায়, কেননা ওতে থাকে, একজন রাত্রির বাসিন্দে। রাত্রি

দশটা থেকে ভোর ছটা তার এলাকা। দিনের বেলাটা অবশ্য আপনার রাজত্ব চলতে পারে।' হুকাকাশি হাসলেন, 'বাস্তবিক, কি দারুণ চাকরি বলুন তো। পাক্কা পনেরো ষোলো ঘণ্টা ডিউটি। তার ওপর আবার একদিন লেট হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি! দেখছি তো, লেট হবার ভয়ে বেচারা কাল বেগ্‌নে হয়ে গেছল, চাকরির এমন মোহ! ভাল কথা, আমি আজ একটু বাইরে যাচ্ছি; কম্বৌলির নাম শুনেছেন তো—সেইখানে। খুব বেশী দূর নয়, নৈহাটি থেকে মাত্র মাইল দুই। চলুন না আমার সঙ্গে, আপনার তো ইতিহাসে খুব ইণ্টারেস্ট, কম্বৌলির মিউজিয়ামটাও এই ফাঁকে দেখে আসতে পারবেন।'

রণজিতের একেবারেই আপত্তি ছিল না, বেলা দু'টার গাড়ীতে দু'জনে রওনা হয়ে পড়লেন।

কম্বৌলিতে পৌঁছে ওঁরা উঠলেন ডাকবাংলোয়। রণজিৎকে খানিকটা বিশ্রাম করে নিতে অনুরোধ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুকাকাশি বার হয়ে পড়লেন, তাঁর কতকগুলো জরুরী কাজ আছে, সেগুলো সেরে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই তিনি ফেরবার চেষ্টা করবেন। কাল বরং সুবিধামত এক ফাঁকে কোন সময় মিউজিয়ামটা দেখে আসা যাবে।

যথা সময়ে ডাকবাংলোয় ফিরে এসে হুকাকাশি দেখলেন, রণজিৎ দোকান থেকে একরাশ খাবার আনিয়ে অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। হুকাকাশিকে ফিরতে দেখেই সে প্রশ্ন করে উঠল, 'কদ্দুর কি করে এলেন?'

'রসুন, রসুন, অত ব্যস্ত হলে কি চলে? আরও দিন দুয়েক আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মিউজিয়াম দেখবার মতলব বোধ হয় ছাড়তে হল—ওতে নাকি কর্তৃপক্ষের অনুমতি চাই, পাস্ চাই, অনেক কিছু ভজকট সম্প্রতি হয়েছে। আমাদের এখানে চেনেই বা কে, আর পাস্‌ই বা কে দিতে যাচ্ছে?"

কিন্তু রণজিতের বরাত ভালই বলতে হবে, কেননা প্রায় বিনা ঝঞ্ঝাটেই মিউজিয়াম দেখার অনুমতি মিলে গেল। রণজিৎ পরমানন্দে হুকাকাশির সঙ্গে মিউজিয়াম দেখতে রওনা হয়ে পড়ল। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত দেখে সিঁড়ি দিয়ে তাঁরা নামছিলেন, রণজিৎ বললে, 'চমৎকার সংগ্রহ। ব্যবস্থাও ভাল, হবে না? অতগুলো কর্মচারী অনবরত খাটছে। আপনি দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে আলাপ করছিলেন? ওই বুঝি মিউজিয়ামের কিউরেটার?'

'না' কিউরেটার উনি নন, অন্য পাঁচজনের মত উনিও একজন সাধারণ

কর্মচারী। লোকটির জ্ঞান-পিপাসা দেখে একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল—দেখুন ওঁর টেবিলের ওপর কতকগুলি বই পড়ে। হ্যাঁ—যা বলেছেন, সংগ্রহ চমৎকারই বটে, তবে আর দিন পাঁচ-সাত আগে এলে আরো ভাল হত, কেননা স্পেশাল একজিবিসন ছিল ; সেটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'তাই না কি' কে বললে ?'

'কে আর বলবে, এই দেখুন না,' হুকাকাশি সিঁড়ির পাশে একখানা ছাপানো বিজ্ঞাপন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, 'নির্দিষ্ট দিনের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।'

কথা বলতে বলতে দু'জনে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন হুকাকাশি বললেন, 'আপনি এবার ডাকবাংলোর দিকে এগোন, কাজকর্ম আমার যা কিছু বাকী আছে সব চুকিয়ে আমিও এসে জুটছি। আজকেই আমরা ফিরে যেতে পারব আশা করি।'

বাস্তবিকই সেদিনই তাঁরা কম্বোলি ছেড়ে ফের কলকাতায় ফিরে এলেন —অবশ্য রণজিতের বাড়ীতে নয়, হুকাকাশির হোটেলে। ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই হোটেলের ম্যানেজার হুকাকাশির কাছে ছুটে এলেন।

'এইমাত্র আপনাকে টেলিফোন করছিল', তিনি বললেন।

'কোত্থেকে ?'

'মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা হোটেলের আপিস কামরায় এসে ঢুকলেন। হুকাকাশি তাড়াতাড়ি টেলিফোনের হাতলটা তুলে নিয়ে অটোমেটিক নম্বর ঘুরিয়ে বললেন, 'হ্যালো, মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল? আমি হুকাকাশি। ওঃ, আপনি দারোগাবাবু! কি খবর? এক্স-রে হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, এক ছড়া মালা তো? ওটা খাঁটি মুক্তোর, দাম কম্‌সে-কম পঞ্চাশ হাজার টাকা। হুকাকাশি হেসে রিসিভারটা রেখে দিলেন।

রণজিৎ স্তম্ভিত, বিহ্বলের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে হুকাকাশি আবার একটু হেসে বললেন, 'আপনার প্রতিবেশী তেরো নম্বর বাড়ীর সেই নতুন ভাড়াটেটির রহস্য ভেদ হয়ে গেছে। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! অবশ্য আজকে আমরা কম্বোলির মিউজিয়াম দেখতে না গেলে এত সহজে রহস্যটা ভেদ হ'ত কিনা সন্দেহ। আপনাকে বলেছি, পাঁচ-সাত দিন আগে ওই মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল একজিবিসনের বন্দোবস্ত হয়েছিল, নানান

জায়গা থেকে অনেক দামী-দামী জিনিস তাতে আসে। সে সমস্ত জিনিসের ভেতরে ছিল একছড়া ষোড়শ শতাব্দীর মুক্তোর মালা, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে সেটা জড়িত। মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী দেখল, সেটাকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যে তেমন হাতসাফাইওয়ালা লোকের পক্ষে ওটা সরিয়ে ফেলা আশ্চর্য নয়। সে তার পূর্ব-পরিচিত এক ভদ্রবেশী জোচ্চোরের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলল—ভিড়ের সুযোগ নিয়ে জোচ্চোর সেই মালা ছড়াকে ট্যাকস্থ করবে। লোকটা বাস্তবিকই নিপুণ হাতে মালা গোছা সরিয়ে ফেললে, কিন্তু ঠিক 'হজম করা তার সাধ্যে কুলাল না, কেননা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিউজিয়ামের রক্ষীরা টের পেয়ে গেল যে একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। ব্যস্, অমনি সমস্ত ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রত্যেকের দেহ তালাস সুরু হল। জোচ্চোর দেখলে আর উপায় নাই এক্ষুণি নির্ঘাৎ মারা পড়বে—প্রাণের দায়ে তাই সে তখন কপ্ করে গোটা মালা ছড়াই গিলে ফেলল। ফলে কর্তাদের শুধু দেহ-তালাসই সার হল, বামাল মিলল না। সেদিনই স্পেশাল একজিবিসন বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর নিয়ম করা হয়—বিনা পাসে মিউজিয়ামে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

'এদিকে মালা গেলবার পরই জোচ্চোরের অবস্থা কাহিল, অসহ্য পেটের ব্যথা। বেচারা সইতেও পারে না, মুখও খুলতে পারে না, কেননা প্রকাশ্যে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলেই ভেতরের সব কথা ফাঁস হয়ে পড়বে, আর তার ফল হবে শ্রীঘর। ব্যাপার দেখে মিউজিয়ামের সেই কর্মচারী—তার নাম এখনও জানতে পারিনি, কাজেই মিউজিয়ামের কর্মচারী বলেই তাকে উল্লেখ করব—এক রাত্রে ওকে এখানে নিয়ে এসে খুব নিরিবিলি পল্লীতে একটা বাড়ী ভাড়া নিলে। পেটে অস্ত্রোপচার করা ছাড়া এ ব্যামোর আর চিকিৎসা নেই; সে রকম ডাক্তার হয়ত মিলতে পারে, কিন্তু ও-চিকিৎসায় জোচ্চোর বেজায় গররাজী। বুঝলেন না, পাপ মন কিনা ভাবলে হয়ত পেট কাটার ছুতোয় পৃথিবী থেকেই তাকে বিদায় দেবার ব্যবস্থা হবে। তাই চেষ্টা চলতে লাগল নানা রকমের জোলাপ নিয়ে। দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর চীৎকার হলে পাড়াপড়শীর সন্দেহ জাগতে পারে, তাই ও সময়টা বেশির ভাগই মর্ফিয়া ইন্‌জেক্ট করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত, জেগে থাকলেও প্রাণের দায়েই ও নিজেও দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকত। যত গোলমাল রাত্রিতে, জাগলে পরেই কাত্‌রানি আর গোঙানি। এই অবস্থা যখন চলছে, তখনই ব্যাপারটা

প্রথম আপনার নজরে এল।

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাপারটা আমি টের পেলাম কি করে। বলছি শুনুন····আপনার ধারণা হয়েছিল, হয়ত আমেরিকার অনুকরণে কোন লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে, মুক্তিপণ দিলে তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতে কিন্তু আপনার ও থিওরী টিকল না। প্রথমতঃ, বন্দীই যদি কাউকে করা হয় তবে তো তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই, বন্দীর ওপর কেন ওরা মার-ধর করতে যাবে? বরং তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখাই স্বাভাবিক, ভবিষ্যতে যাতে তার কোন আক্রোশ না থাকে। তার চাইতেও বড় যুক্তি এই যে, বাস্তবিকই অত্যাচার অথবা মার-ধর তারা যদি করেই থাকত তো আমরা—অর্থাৎ আমি আর আপনি—দু'বার ও-বাড়ী যাবার পরই তা বন্ধ হয়ে যেত। ইচ্ছে করে কে কবে পাড়াপড়শীর সন্দেহ জাগাতে চায় বলুন? না, অত বোকা ওরা নয়; সে-রকম মতলব থাকলে অন্যত্র কোথাও সরে পড়ত নিশ্চয়ই। গোলমাল যেটা হয়েছে সেটা ওদের ইচ্ছাকৃত নয়, চেষ্টা করেও সেটা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। বোঝা গেল রহস্যটা অন্য ধরনের। কি ধরনের রহস্য তাও যে একটু একটু আঁচ করতে না পারলাম তা নয়। সেদিন বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কথা মনে আছে? লোকটা যে ক্রমাগত গেঞ্জীর ডান হাতটা নীচের দিকে টেনে দিচ্ছিল, ওটা কোন মুদ্রাদোষ নয়—ইঞ্জেকসনের দরুন হাতের খানিকটা জায়গা ফুলে ঢিবির মত হয়ে উঠেছিল, সেইটাকেই ঢাকবার চেষ্টা। হাতের অবস্থা দেখে আর নুনের পুঁটলিটা পেয়ে যাওয়ায় ওই লোকটাকে যে ইঞ্জেকসন দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। সমস্ত দিন দোতলা থেকে ও-বাড়ীটার চারিদিকে আমরা নজর রেখেছি, কাউকে ঢুকতে দেখিনি, তবে ডাক্তার এল কখন? বুঝলাম, গভীর রাত্রের ওই মোটরখানা আর কিছু নয়, ডাক্তার আমদানীর ব্যবস্থা, ব্যাপারটা কেমন আগাগোড়া গোপন রাখবার চেষ্টা হচ্ছে দেখছেন তো! খুব গোপনে তার চিকিৎসা চলছে। কি অসুখ তা তারা কাউকে জানতে দিতে রাজী নয়, কেননা, তাতে নাকি তাদের জেল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

'ডাক্তার যখন চিকিৎসা সুরু করেছে আর রোগীর অবস্থার যখন উন্নতি হয়নি—ব্যথা চাপবার চেষ্টা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তখন ডাক্তারকে যে ফের আসতে হবে তা বুঝতে কষ্ট হল না। বাস্তবিকই গভীর রাত্রে আবার মোটর এল, সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে খুব ধীরে ধীরে।

আমিও নীচে নেমে রাস্তার ধারে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম ; তারপর খানিক বাদে মোটর ফিরে যেতেই পেছন থেকে টর্চের আলো ফেলে গাড়ীর নম্বরটা দেখে নিলাম। ডাক্তারের পাশে গাড়ীতে আর একজন লোক বসেছিল। গাড়ীর নম্বরটা যে আসল নম্বরই তাতে ভুল ছিল না, কেননা, নকল নম্বর হলে পেছনের আলো নিভানো থাকত না। পরদিন সকালে বেরিয়ে মোটর রেজিস্টার ঘাঁটতেই দেখা গেল ওখানা এই হোটেলের গাড়ী। সেদিনই সকালবেলা আমায় হোটেলে উঠে আসতে দেখে আপনি আশ্চর্য হয়েছিলেন না কি ?

'হোটেলের যে রুমটা আপনার খুব পছন্দসই হয়েছিল, আমরাও প্রথম নজর পড়েছিল সেইটারই ওপর, এবং যে জবাব আপনাকে দিয়েছি সেটাও ম্যানেজারেরই দেওয়া জবাব। জবাবটা আমারও খুব আশ্চর্য বলে মনে হল—সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে লোকটা করে কি ? অপিসে আর কিছু এতক্ষণ খাটায় না। কথা বলতে বলতে ম্যানেজারের সঙ্গে আমি নীচে নেমে এলাম। হঠাৎ ম্যানেজার বলে উঠলেন, 'একি, ও-ঘরের ভদ্রলোক যে আজ এরই মধ্যে ফিরে আসছেন। এই তো সবে বেরিয়ে গেলেন।' তাকিয়ে দেখি একটি লোক স্টেশনের কুলীর হাতে স্যুটকেশ চাপিয়ে হোটেলের দিকে এগুচ্ছে, খুব ব্যস্ত-সমস্ত ভাব তার মুখে-চোখে। ম্যানেজারের সামনে এসেই সে বললে, 'মোটরখানা আর একবার চাই, ম্যানেজারবাবু, না হলেই নয়, বিশেষ দরকার।'

ম্যানেজারের অবশ্য গাড়ি দিতে কোন আপত্তি ছিল না, বিল বেশী উঠলে তাঁর আর ক্ষতি কি ? কিন্তু ড্রাইভারের আপত্তি দেখা গেল—এই রাত্তিরে সে গাড়ী চালিয়ে এল, আবার এক্ষুণি.......। কিন্তু ম্যানেজার ধমকে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে, দরকার হলেই যেতে হবে।'

'দুটি জিনিস তৎক্ষণাৎ আমার চোখে পরিষ্কার হয়ে গেল, প্রথমতঃ লোকটা রেলে কোথাও যাবে বলে রওনা হয়েছিল, গাড়ী ফেল করাতে ফিরে এসেছে। নইলে স্টেশনের কুলী পেল কোথা ? দ্বিতীয়তঃ, সে বলছে, 'মোটরখানা আর একবারটি চাই', তার মানে এর আগেই সে আরও একবার গাড়ী নিয়েছে। ড্রাইভার বলছে, এর আগেই তাকে বার হতে হয়েছিল রাত্তিরে। এ থেকে আন্দাজ করতে মোটেই কষ্ট হল না যে আগের দিনে তেরো নম্বর বাড়ীতে মোটরে যে দুটি লোক এসেছিল, এ লোকটি হচ্ছে তাদেরই একজন। কিন্তু কোন জন—ডাক্তার না তার

সহযাত্রীটি ? যাই হোক, সম্প্রতি লোকটা কোথায় যাচ্ছে তা জানা এর পর কঠিন হবে না, কেননা, ড্রাইভার এখন থেকেই যখন আপত্তি জানাচ্ছে তখন সে ফিরে এলেই ফের তাকে গাড়ী বার করতে বলা যাবে। নিশ্চয়ই সে তখন প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলবে যে এইমাত্র এত দূর থেকে সে ঘুরে এল, এখন আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তখন 'কোথায় গিয়েছিলে ? প্রশ্ন করলেই জায়গাটার নাম বেরিয়ে পড়বে।'

'ঠিক সেই মতলব অনুযায়ীই কাজ করা গেল ; ড্রাইভার জানাল, বাবুটিকে সে নৈহাটিতে রেখে এসেছে। অনেক রাত্রে লোকটা আবার হোটেলে ফিরে এল। ভোরে সে যখন ফের বার হচ্ছে তখন আমি তার পিছু নিলাম। শিয়ালদায় এসে দেখি সে নৈহাটিরই টিকিট কাটছে। আমিও চললাম সেই সঙ্গে সঙ্গে নৈহাটি। নৈহাটি জংসনে নেমে সে ধরল কম্বৌলি রোড ; আমিও কিছু দূরে সমানে তার পেছু পেছু। তারপর কম্বৌলি যে তার দিনের লীলাভূমি, এ তথ্যটি নিশ্চিত জেনে আমি ফিরে এলাম কলকাতায়—বেলা প্রায় দশটার সময়।

'এর পর আপনি এলেন আমার হোটেলে আর আমরা দু'জনে রওনা হয়ে গেলাম কম্বৌলিতে। এখানে আপনাকে একটু ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, মিউজিয়াম দেখবার অতটা আগ্রহ যদি আপনি প্রকাশ না করতেন তবে রহস্য ভেদ হতে আরও কিছু সময় লাগত। কেননা, আমার হোটেলের সেই রহস্যময় লোকটি যে কম্বৌলি মিউজিয়মেরই একজন কর্মচারী তা তখনও জানতে পারিনি। আমরা যখন ভেতরে যাই তখনও একরাশ ফাইলের সামনে বসে খুব মন দিয়ে একখানা মোটা বই পড়ছিল, তবু তার হুঁসই নাই। দেখলাম, ওটা একটা ডাক্তারী বই, যে পরিচ্ছদটা ও মন দিয়ে পড়ছে সেটা জোলাপ সম্বন্ধে, হঠাৎ আমার উপস্থিতি টের পেতেই ফট করে বইখানা বন্ধ করে ধরা-পড়া অপরাধীর মত আমার দিকে সে চাইলে। যেন কিছুই দেখিনি এমনি ভাবে মিউজিয়াম সম্বন্ধেই গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমি সরে এলাম।

'আমার মনে তখন পর পর কয়েকটি প্রশ্ন জাগল। এ মিউজিয়ামটি হওয়া অবধি এতকাল সর্বসাধারণেরই এখানে ঢুকবার অধিকার ছিল, কোন পাসের দরকার হত না। হঠাৎ পাঁচ-সাত দিন হল সে নিয়ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ, এখানে আর যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। মিউজিয়ামে একটা স্পেশাল এক্‌জিবিসন চলছিল, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী

যতদিন সেটা চলবার কথা তার আগেই কর্তৃপক্ষ হঠাৎ সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এসব কড়াকড়ি মানে কি? তবে কি কোন দামী জিনিস হালে এখান থেকে চুরি গেছে? নিশ্চয়ই তাই, নইলে কর্তৃপক্ষের এ রকম ব্যবহারের আর কোনো দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এ রহস্যময় লোকটি দেখছি এখানকারই কর্মচারী। এ চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই তো? নীচে নেমেই তাই আপনাকে বিদায় দিয়ে আমি মিউজিয়ামের কর্মকর্তা—কিউরেটারের ঘরে ঢুকলাম। অল্প একটু আলাপের পরই দেখা গেল আমার অনুমান মিথ্যা হয় নি, বাস্তবিকই একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মুক্তোর মালা চুরি গেছে। এবার পরের প্রশ্ন। কিউরেটারের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে কেউ ডেলি-প্যাসেঞ্জার নেই, সকলকেই কম্বৌলিতে থাকতে হয়, তাঁর বিনা অনুমতিতে কম্বৌলি ছেড়ে কোথাও কারও যাবার হুকুম পর্যন্ত নেই। অথচ এ লোকটি দেখছি আজ পাঁচ-সাত দিন ধরে রোজই রাত্রের গাড়ীতে গোপনে কলকাতা যাচ্ছে—নৈহাটির মত অত বড় জংসন স্টেশনে কেই বা কাকে চেনে! কলকাতা সে যাচ্ছে একটা লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। তার সেই রোগীটি অসহ্য ব্যথায় দিনরাত পড়ে কাত্‌রাচ্ছে, অথচ সে ব্যথার কারণ ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করবার উপায় নেই, সাধারণ ডাক্তারের কাছেও না। কেননা, তাহলে নাকি তাদের সবারই জেল হয়ে যাবে। এখানে হাজার কাজের মধ্যেও এ লোকটা বসে বসে চিকিৎসা-শাস্ত্রেরই বই পড়ছে—নানা রকম জোলাপ সম্বন্ধে। ওষুধটা যখন জোলাপ, ব্যথাটা নিশ্চয়ই পেটের। পেটের ব্যথার সঙ্গে কোন জিনিস চুরির একমাত্র সম্বন্ধ থাকতে পারে যদি চোরাই মালটা হয় খুব ছোট, আর চোর সেটাকে গিলে ফেলে থাকে। কি অবস্থায় মুক্তোর মালা চুরি হয়েছিল কিউরেটার তা বলেছিলেন। শুনে আর কোন সন্দেহই রইল না যে আপনার প্রতিবেশী ওই তেরো নম্বরের ভাড়াটের মালা-চোর—চুরির পরেই বেগতিক দেখে সেটা গিলে ফেলেছে। কিউরেটারকে তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বিদায় নিলাম। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা তো দেখতেই পাচ্ছেন—আমি চলে আসতেই কিউ-রেটার কলকাতার পুলিসের কাছে ফোন করেছিলেন, তারা লোকটাকে মেডিকেল কলেজে ধরে নিয়ে গেছে, আর সেখানে এক্স-রে করতেই ওর পেটের ভেতর মুক্তোর মালাটির সন্ধান মিলে গেছে।'

———